প্রথম অধ্যায়

উপন্যাসে মৃত্যুর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যে ও উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের উত্থান পতনের সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ আছে। জন্ম দিয়ে জীবনের শুরু, মৃত্যু তার সমাপ্তি। তাই উপন্যাসে মৃত্যুর আছে এক বিশেষ ভূমিকা। উপন্যাসে মৃত্যুর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবার পূর্বে উপন্যাস সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন সেই সঙ্গে মৃত্যু কী? মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কি সম্পর্ক? মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন ধারণার উপস্থাপনা করা জরুরী। তবেই মৃত্যু উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে কিভাবে, কতটা প্রভাবিত করে তা পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে যে বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ধারা হল উপন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়েই উপন্যাসের জন্ম হয়। সাহিত্যিক কথা শিল্পীর মত তার মনের কাল্পনিক চিত্রকে সুসংবদ্ধ ও সংহত রূপ দেবার জন্য বাস্তব জীবনের খন্ড খন্ড ছবিগুলিকে ধারাবাহিক ভাবে একই সূত্রে গেঁথে তোলেন তখনই সৃষ্টি এক সম্পূর্ণ উপন্যাসের।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংলা ভাষার জন্ম। জন্ম হয় বাংলা সাহিত্যের। প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলিকে বাংলায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে। সংস্কৃত ধর্মশাত্র, পুরাণ ও প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলির ভাষান্তরের মধ্য দিয়েই ক্রমে বাংলার সাহিত্যকালের গতি এগিয়ে আসে বাস্তবতার দিকে। প্রাচীন উপাদানগুলিকে তাঁদের নিজের যুগের ছাঁচে ঢেলে, দেব ভাষার

অতিরঞ্জিত অলংকার মুখর, শব্দৈশর্যভারাক্রান্ত বর্ণনাগুলি টুকরো টুকরো করে ছোট করে বাংলায় গ্রহণ করা হতে থাকে, ক্রমে আধুনিকতার রস সঞ্চার করে এক নতুন ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলি যা সাহিত্যে পূর্বে ছড়ান থাকত, সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে এক বাস্তব আখ্যায়িকার রূপ লাভ করে নতুন প্রণালীর সঞ্চার করে। অনেক সমালোচকের মত এইযে রূপকথা, চৈতন্য চরিত্রগ্রন্থ ও ময়মনসিংহ গীতিকার মধ্যে উপন্যাসের বিস্ময়কর পূর্বসূচনা লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীকালে ইংরেজী শিক্ষা বাঙালীর মনে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই নব্য ধারাকে কেন্দ্র করে সমাজে দেখা দেয় বাদ-প্রতিবাদ, কোলাহল মুখর উত্তেজিত প্রতিবেশ। সংবাদপত্রে তৈরী হতে থাকে হাস্যোদ্দীপক নানা লেখা ও ব্যঙ্গ চিত্র। ফলে, সংবাদপত্রের মাধ্যমেই রচিত হয় উপন্যাসের পূর্ববর্তী স্তর। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রমথনাথ শর্মার রচিত 'নববাবু -বিলাস' — প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবি করে। পরে ১৮৫৮ তে রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলাভাষায় প্রথম সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করে। এক্ষেত্রে বলা যায় ইংরেজী উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটার পরই সৃষ্টি হয় বাংলা উপন্যাস। এ বিষয়ে সুকুমার সেন বলেছেন যে উপন্যাসের আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক ঘটনা। যতক্ষণ পর্যন্ত সভ্য মানুষ বাস্তব জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে না ওঠে ততদিন উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকেনা। পাশ্চাত্য দেশে যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হল অর্থাৎ মানুষ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ছেড়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে লব্ধ আধিভৌতিক কার্যকারণের উপর

আস্থাবান হল তখনই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার কৌতুহলের উদয় হল। যার ফলে সাহিত্য সৃষ্টিও নূতন রূপ নিল, নভেলে। ড: সুকুমার সেনের ভাষায় 'দেবদেবী, যক্ষরক্ষ, রাজারানী ছাড়িয়া সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের জীবনের অনুজ্জ্বল কাহিনীতে উৎসাহ জাগিল। টাইপ বা অতিব্যক্তির এবং হীরো বা অতিমানবের স্থান লইল সাধারণ লোক, যে লোক বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের অথবা শ্রেণীর মুখপাত্র নয়, যে কেবল নিজেরই প্রতিনিধি।[১]

জীবনের বাস্তবতা ও ধারাবাহিকতায় উপন্যাসের সৃষ্টি, আর জন্ম মৃত্যু নিয়েই মানুষের জীবনধারা। জীবনের একদিকে আছে জন্ম অপর দিকে আছে মৃত্যু। মৃত্যু আছে বলেই জীবন আমাদের কাছে এত বেশী আকর্ষণীয়। তাই সাহিত্যে জীবনের যে বিচিত্র রূপায়ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মধ্যে মৃত্যুর এক বিশিষ্ট ভূমিকা থেকে যায়।

সাধারণভাবে মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের ধারণা কী? শুধু মানুষ জীব মাত্রেই কি বেঁচে থাকার তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা প্রাণী মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আদিম যুগ থেকেই মানুষও তাই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছে। মৃত্যুভয় জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। মানুষের কাছে এক রহস্য। মানুষ যখন বেঁচে থাকে হাসে, কথা বলে, গল্প করে, নানা কাজে লিপ্ত থাকে, ব্যথা পেলে কাঁদে অথচ জীবনদীপ নিভে যাওয়া মাত্রই জড় পদার্থের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় যা আপনজনকে আঘাত করে। আপনজনের কাছেও জড় পদার্থের মত পড়ে থাকা দেহটিও রহস্যঘেরা অপরিচিত হয়ে ওঠে। মৃত্যু এসে এক মুহূর্তে যেন চেনা কে অচেনা, জানাকে অজানা করে তোলে, সে মানুষটির আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়

না। মানুষ তার একান্ত আপনজনকে চিরকালের মত হারিয়ে ফেলে। তাই মৃত্যু জীবনে এক বিরাট রহস্য। মৃত্যুতে মানুষের বাহ্যিক দেহ-রূপের অবসান ঘটে। জীব মাত্রেরই মৃত্যুর ফলে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে দেহটি তখন দাহ অথবা সমাধিস্থ করা হয় অথবা পশু-পক্ষীর আহার্য হয়। দেহ শেষ হলেও ভেতরের মানুষ জীবটি ফুরিয়ে গেছে বলে মেনে নিতে চায় না মানুষ। সাধারণ মানুষ আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি নানা ব্যাখ্যা দেয় কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় কোন ধারণাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। তাই মৃত্যু রহস্যময় মনে হয়। মৃত্যুর পর কি হয়, মানুষের আত্মা দেহত্যাগ করে কোথায় যায়? আত্মার অস্তিত্ব কি থাকে? এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন মানুষকে যুগ যুগ ধরেই ব্যাকুল করে চলেছে। গীতাতে বলা হয়েছে বিষয়টি আমাদের নাগালের বাইরে, বোধশক্তির বাইরে, তা বলে প্রকাশ করা যায়না, তা অব্যক্ত। মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উপনিষদের ঋষি মনকে আলোড়িত করেছিল। উপনিষদে মৃত ও অমৃত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। জীবনের বিপরীত হলো মৃত্যু। জীবনের যখন পরিসমাপ্তি ঘটে তখনই মৃত্যুকে আমরা পেয়ে থাকি। অন্যদিকে অমৃতশব্দের অর্থ পরিষ্কার বা সুস্পষ্ট নয়। উপনিষদে এবং অন্যত্র বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অমৃত অর্থে আমরা বুঝি যা জীবিত, যার মৃত্যু নেই অমর। দ্বিতীয়ত, আনন্দের সমার্থবোধক। এছাড়া অমৃত অর্থে বলা যেতে পারে উপনিষদোত্তর যুগে পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সমুদ্র মন্থন করে যা পাওয়া গিয়েছিল এবং যা পান করে দেবতারা অমর হয়েছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনীতে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করেছিলেন, যদি সমগ্র পৃথিবী বিত্তে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয় তাহলে কি তিনি 'অমৃতা' হবেন? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন বিত্তের দ্বারা 'অমৃতত্ত্বের' আশা করা যায়না।[২] প্রাচীন উপনিষদে আত্মা, ব্রহ্ম অমৃত ও আনন্দকে পরস্পর সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অমৃতের আস্বাদনে আনন্দ উপলব্ধি ঘটে তাই অমৃত ও আনন্দ একরকম সমার্থবোধক।

"কি করে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু আনন্দের বা অমৃতের উপাদান হয়ে যায় তা বুঝতে হলে আমাদের আবার আনন্দের সংজ্ঞার উল্লেখ করতে হয়। দুই পক্ষ যখন খেলে তখন একপক্ষ হারে আর এক পক্ষ জেতে। সেখানে যে পক্ষ হারে তার ভাগ্যে দুঃখ, আর যে পক্ষ জেতে তার ভাগ্যে সুখ। যারা এই দুই পক্ষের সমর্থক তাদের ভাগ্যেও তাই ঘটে। আর যদি কেউ নিরপেক্ষ দর্শক থাকেন, তাঁর ভাগ্যে সেই দুর্লভ বস্তুটি জোটে যাকে উপনিষদে বলে আনন্দ বা অমৃত। তার কারণ তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে খেলার রস গ্রহণ করেন। একদলের হার ও অপর দলের জিত তাঁর কাছে অর্থহীন; খেলা কতখানি জমে উঠল তাই তিনি দেখেন। অর্থাৎ তিনি খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টিকে দেখেন না, অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন।"[৩] ব্রহ্মের দ্বৈতভাব মন্ডিত মূর্তরূপে মৃত্যু আছে কিন্তু এক্ষেত্রে মৃত্যুকে আনন্দের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মৃত্যুতে শোকবোধ আছে কিন্তু সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে উঠলে শোকে দাহিকা শক্তি থাকে না। আমরা আনন্দ বা অমৃত লাভের যোগ্য হয়ে উঠি। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যদি বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন আকারে দেখা যায় মৃত্যু গভীর

শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপনিষদে এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে মোহ বা অবিদ্যা বলা হয়েছে। উপনিষদ আরো বলে যে বিশ্বকে যদি অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা যায় তাহলে অমৃতের অধিকারী হওয়া যায় আর এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে উপনিষদে বিদ্যা বলা হয়।

গীতায় আমরা দেখি অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন দেখলেন তাঁকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। সকলেই তাঁর আপনজন। এদের মধ্যে অনেককে তিনি শ্রদ্ধা করেন, স্নেহ করেন; তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন এঁদের হত্যা করতে আমার ইচ্ছে করছেনা। পৃথিবী কেন সমগ্র ত্রিলোকের আধিপত্যের জন্যও মারব না। (গীতা) তখন শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন 'ময়ি সর্বাপি সংন্যসাধ্যাত্ম চেতসা। নিরাশীর্নির্মমো ভুত্বা যুধ্যস্ব বিগতস্বারঃ' (গীতা) অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, আমার উপর সকল কর্মের ফল ন্যস্ত করে, ইন্দ্রিয়ের প্রতি অনাসক্ত থেকে এবং মমতাহীন হয়ে বিকার হতে মুক্তিলাভ কর এবং যুদ্ধ কর। সুতরাং গীতায় দুটি দিক আমরা লক্ষ্য করি ঃ— একদিকে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে বলা হয়েছে, অন্যদিকে হৃদয়বৃত্তিকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। গীতার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কান্টের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল আছে। কান্টের ধারণায় মানুষ দুই জগতের জীব। মানুষ রক্ত মাংসের দেহধারী জীব হিসাবে ইন্দ্রিয় সুখে আকৃষ্ট হয়। আবার প্রজ্ঞাবান জীব হিসাবে বিশুদ্ধ বুদ্ধি শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে অর্থাৎ কান্ট বলতে চেয়েছেন মানুষ প্রজ্ঞার নির্দেশে কর্তব্য সম্পাদন করবে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। হৃদয়বৃত্তির প্রভাব মুক্ত মানুষ সুখ-দুঃখবোধের উর্দ্ধে। মৃত্যুলোক তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

পাশ্চাত্য চিন্তায় শরীর মন ও মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে অনেক আলোচনা হয়েছে। বস্তুত, বিভিন্ন দার্শনিক ও চিন্তা নায়কেরা শরীর ও আত্মা, আত্মা ও মন এবং শরীর ও মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তা জগতে যেভাবে এই বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা হয়েছে তা একদিকে যেমন গভীর অন্যদিকে তেমন জটিল। মূলত একটি প্রশ্নকেই কেন্দ্র করে সমস্ত বিষয়টি আবর্তিত হয়েছে আর তা হল শরীর বা দেহের পরিসমাপ্তি কি মৃত্যু? এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন স্যার চার্লস শেরিংটনতাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Man and His Nature যা ১৯৪৩ সালে কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় একইভাবে লর্ড আদভিয়ান তাঁর The Physical Basis of Mind নামে প্রকাশিত বক্তৃতামালায় এই বিষয়ের অবতারণা করেন। এই বইটি ১৯৫০ সালে অক্সফোর্ড থেকে হবার পরে পাশ্চাত্য চিন্তার নতুন আঙ্গিকের জন্ম নেয়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর ওয়াইলডার পেনফিল্ড এর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে "what is the real relation of this (nervous) mechanism to the mind? Can we visualize a spiritual element ... capable of controlling this mechanism"? অর্থাৎ মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে মনের প্রকৃত সম্পর্ক কী? আমরা কি এমন এক দৈব শক্তির কল্পনা করতে পারি যা এই যান্ত্রিক পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

সহজেই বোঝা যায় আলোচনার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে "আধ্যাত্মিক উপাদান", — তার অবস্থান বা ক্ষমতা নিয়ে বিতর্ক। এই বিতর্কই

আসলে দেহ মন ও মৃত্যুর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু যা পাশ্চাত্য (পরবর্তী কালে প্রাচ্য) চিন্তাধারায় একটা গভীর ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

দেহ, মন ও মৃত্যুর দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত হয় প্লেটোর রচনায়। আত্মার অবিনশ্বরতা নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। অ্যারিস্টটল তাঁর আলোচনায় "Nature and essence of soul" এর উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে জীবন বা আত্মা হল "The form of the particular living body" এই ধারণাতে তিনি প্লেটো-কেও ছাড়িয়ে গেছেন মনে হয়। যে ঐতিহ্য প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল প্রবর্তন করেছিলেন তা মূলত প্রাচীন। দেকার্তে এই দিক থেকে আধুনিক চিন্তার জন্ম দেন যদিও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখ যাবে যে তিনিও প্লেটো প্রবর্তিত ভাবধারাকে একেবারে বর্জন করতে পারেননি। বাস্তবতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "Both animal and human bodies might be regarded as machinery" অর্থাৎ প্রাণীজ এবং মনুষ্য দেহ উভয়েই যন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।[৪]

বিষয়টির আরও গভীরে গিয়ে তিনি যা মন্তব্য করেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। তার মতে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সঙ্গে মানব মনের শুধুমাত্র গঠনমূলক নয়, কার্যকারণগত বৈসাদৃশ্য আছে। তাঁর মতে ঃ—

'মানব আকৃতিতে কোন যন্ত্র তা যতই সর্বোতমভাবে তৈরী করা হোক না কেন, দুভাবে মানুষের থেকে আলাদা করে দেখা যায় ঃ এক, যন্ত্র সঠিকভাবে

কোন কিছুর উত্তর দিতে পারে না, দুই, বৈচিত্রের অভাবের জন্য যন্ত্র শুধুমাত্র গতানুগতিক কাজ করতে পারে - জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করতে পারে না'।

আবার ফ্লুক্রিটাস রিডিঙের মতে "Life and Conciousness from non-living and non-conscious elements"- অর্থাৎ 'জীবন এবং সচেতনতার জন্ম নির্জীব এবং অচেতন উপাদান থেকে। একই ধরণের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে স্পিনোজা এবং লকের রচনাতেও পাওয়া যায়।

এখানেই দেকার্তে এর আলোচনার মৌলিকত্ব যা প্লেটো'র ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে প্রতিভাত হয়। এই বিচারে দেকার্তের ধারণা বৈপ্লবিক। তাই বলা হয়ে থাকে যে দেকার্তে যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি সচেতনার বদ্ধ বৃত্তের মধ্য থেকে পৃথিবীকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। একটু অন্য পরিপ্রেক্ষিতে "Personal identity" বিষয়টির অবতারণা করতে গিয়ে "Personal identity"-র ধারণাটিকে তিনি "Consciousness (memory)"-র সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি ব্যক্তির Consciousness কে Substance বা Pure ego-র দিক থেকে বিচার করতে চেষ্টা করেছেন। এই সব ধারণা থেকেই পরবর্তীকালে "Theory of self" তত্ত্বের জন্ম হয়েছে যা অনেকদিন ধরেই পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণাকে বহুলাংশে পুষ্ট করেছে।

এই ধারণাগুলো এতই তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক যে হিউম্ পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে "Personal identity"-র ধারণা বহুলাংশে মানুষ তার মন এবং মৃত্যু ব্যক্তি নির্ভর (বস্তুনিষ্ঠ নয়) মানসিকতার দ্বারা বুঝতে চেয়েছেন। হিউমের মতে পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরন্তন নয়। এই সতত পরিবর্তনের জগতে প্রতিটি

ধারণা পরিবর্তনশীল। হিউমের মতে ব্যক্তির মন বা আত্মা এবং তার সঠিক অবস্থান সামগ্রিকভাবে সমাজের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের নিরিখে বিচার করা উচিৎ। সমাজের ব্যক্তির অবস্থান স্বভাবতই কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল।

এই প্রসঙ্গে দেকার্তের ধারণা আরও স্পষ্ট। তাঁর মতে ব্যক্তির আচরণ সব সময়েই কোন সচেতন বা সঠিক ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় না। এক্ষেত্রে অনেক সময় মানসিক অনুভূতি বা আবেগ কাজ করে যা সবসময় বিশেষ কোন অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং শুধুমাত্র জাগতিক কোন ঘটনা পরম্পরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় মৃত্যু একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এ্যান্টনি ফ্লিউর মতে আধি দৈবিক ধারণা মনকে বুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করে। এই ধারণায় বলা হয় যে তথাকথিত মৃত্যুর এখানেই শেষ নেই। এই চিন্তায় আদর্শ জীবনের অবতারণা করা হয়েছে; এই ধারণায় এক ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা করা হয় যা প্রত্যেকেই প্রত্যাশা করে থাকে।

অন্যদিকে ভারতীয় চিন্তাধারায় মৃত্যুকে জীবনের বিপরীত না ভেবে জন্মের বিপরীত ভাবা হয়েছে। এ দুটো যে একই ধারণার দুটো দিক। তাই বলা হয়, যখনই কোন কিছু তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তার পূর্ববর্তী অবস্থার মৃত্যু ঘটে এবং পরবর্তী অবস্থার জন্ম হয়। অন্যভাবে বলা যায় জীবন মৃত্যু দুটিই একই ঘটনার দুটো দিক যা দুভাবে দেখা যায় এবং একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

ভারতীয় চিন্তা ধারায় দেহ নশ্বর হলেও আত্মা অবিনশ্বর । আত্মার মৃত্যু নেই। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের মতই আত্মা দেহ পরিত্যাগ করে থাকে। মৃত্যুর পর আত্মার নতুন যাত্রা শুরু হয়। এক্ষেত্রে স্বর্গ ও মর্ত্যের বিরাট ভূমিকা আছে । কর্মফল অনুযায়ী আত্মা স্বর্গ বা মর্ত্যে গমন করে থাকে। পুণ্যাত্মা স্বর্গে গমন মহাসুখ লাভ করে, পাপাত্মাকে নরকে গমন করে কর্মফল ভোগ করতে হয়। নরকের নানা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে যম এবং যমদূতের এক বিরাট ভূমিকা থাকে। মৃত্যুর পর বলা হয় আত্মা তার পূর্বস্থানেই ঘোরাঘুরি করে; সেইজন্যই ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী তেরো দিনে শ্রাদ্ধ করা হয় এরপর আত্মা নতুন জীবনের পথে পা বাড়ায়। এই যাত্রা সমাপ্ত হতে সময় লাগে এক বৎসর। এই এক বৎসর আত্মা আত্মীয়গণ কর্তৃক যে যে পিন্ডদান করা হয় তা দিয়ে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং এই এক বৎসর পর যাত্রা সমাপ্ত হয় বলেই বাৎসরিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়। এ বিষয়ে ইতালীর গিলান গিউসেফ ফিলিপ্পির লেখা MRTYU: Concept of death in Indian Traditions বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে কঠ-উপনিষদের একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। নচিকেতা রাজশ্রবস মুনির পুত্র। মুনি যজ্ঞ সম্পাদন করে যজ্ঞফল কামনায় সেই যজ্ঞে তাঁর সর্বস্ব দান করেন। তখন নচিকেতা পিতার কাছে জানতে চান, তাঁকে কোন ঋত্বিকের উদ্দেশ্যে দান করেছেন। নচিকেতা বারবার প্রশ্ন করায় মুনি বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন তোমায় যমকে দেব। ফলে যমের বাড়ী আনীত হলেন। পিতার উপর অভিমান করে নচিকেতা উপবাস করে থাকেন। যম নচিকেতাকে অভুক্ত থাকতে নিষেধ করেন। অতিথি উপবাস করে থাকলে

অকল্যাণ হয় এইরূপে বিবেচনা করে নচিকেতাকে খাদ্য গ্রহণ করতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত যম নচিকেতাকে তিনটি বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নচিকেতা মৃত্যুলোকে গিয়ে যমকে বিবিধ দার্শনিক প্রশ্নে মুগ্ধ করে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এই মৃত্যুঞ্জয়ী নচিকেতা বর হিসেবে যা যা জানতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল মৃত ব্যক্তির কি অবস্থা হয় তিনি জানতে চেয়েছিলেন। 'যে মৃত ব্যক্তির বিষয় মানুষের সংশয়, কেউ বলে সে থাকে, কেউ বলে থাকে না, এ বিষয় বিদ্যা আপনার নিকট শিক্ষা করব এই হলো আমার তৃতীয় বর'। যম তাঁকে নানা লোভ দেখিয়ে যখন নিরুৎসাহ করতে পারলেন না তখন নচিকেতাকে মৃত্যু এবং শ্রেয়তত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। ঋগবেদেও যম এবং নচিকেতার সাক্ষাৎকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। উপনিষদের মৃত্যু ও অমৃত নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখানে বলা হয়েছে মৃত্যু আছে কিন্তু মৃত্যু ব্রহ্ম বা আত্মাকে স্পর্শ করে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে 'এই আত্মা এ নয় ও নয়। তিনি অগৃহ্য, তাই তাঁকে গ্রহণ করা যায় না। অশীর্ণ, তাই তাঁকে শীর্ণ করা যায় না। তিনি অসঙ্গ, তাই তাঁকে সঙ্গ দেওয়া যায় না, তিনি অনুভূতিহীন, তাই তাঁকে ব্যথা দেওয়া যায় না, তাঁকে বিনাশ করা যায় না। (বৃহদারণ্যক ।৪।২।৪)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলেছিলেন "এই হলেন সেই অক্ষর যাঁর সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন যে তিনি অস্থূল, অণু নয়, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, তৈলগুণ সম্পন্ন নন, বায়ু নন, আকাল নন তিনি সঙ্গহীন, রসহীন, গন্ধহীন, চক্ষুহীন, শ্রোত্রহীন, বাক্যবর্জিত, মন বর্জিত, তেজ বর্জিত, প্রাণহীন, মাত্রাহীন, ছিদ্রহীন, তাঁর বাইরে অভিব্যক্তি নাই, তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না,

তাঁকেও কেহ ভক্ষণ করে না। ... ... এই অমূর্ত অবস্থা হলো ব্রহ্মসৃষ্টির পূর্ব অবস্থা। ... ... একক অসঙ্গ ব্রহ্ম রস অভিলাষী হয়ে এই সৃষ্টি প্রবাহ প্রবর্তিত করলেন। তখন বহু বিচিত্র বস্তুর সমাবেশে গঠিত এই বিশ্ব এল। তারা পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধে যুক্ত হল। মানুষের মনে চেতনা এল। তার সুখবোধ এল, দুঃখবোধ এল। জন্ম এল, মৃত্যু এল, তার মৃত্যুলোক এল।''[৬]

উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, যখন আমরা খন্ড বা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখি, দুঃখ, তাপ, শোক বা মৃত্যু আমাদের পীড়িত করে। তবে এদের আঘাত থেকে মুক্ত হতে প্রয়োজন অখন্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে মৃত্যু, রোগ ও দুঃখ সমগ্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং আনন্দের উপাদান হয়ে যায় তখন এগুলি আঘাত মনকে স্পর্শ করে না। যেমন আমরা যখন নাটক দেখি তখন কোন বিশেষ চরিত্রের সুখে আনন্দিত হই, আবার কখন তাদের দুঃখে মন ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু যদি দর্শক সমগ্র রস উপলব্ধিতে আগ্রহী হয়, শিল্পরসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখার চেষ্টা করে তখন চরিত্র বিশেষের সুখ-দুঃখ আনন্দের উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। শোক বা মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

তিনি আরো লিখেছেন যে, আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে যেমন অবিদ্যাকে মায়ার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন তেমনি এই অবিদ্যা শব্দটি ভগবান বুদ্ধও ব্যবহার করেছেন। তিনি দুঃখময় জীবনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে বারোটি কারণ পেয়েছিলেন। তিনি তাদের দ্বাদশ নিদান বলে উল্লেখ করেছেন। এই দ্বাদশ নিদানের মূলে আছে অবিদ্যা। অবিদ্যা হল সেই মিথ্যাজ্ঞান বা অহংবোধ। অহংবোধ বা দ্বৈতভাবের ভিত্তিতে বিশ্ব সম্বন্ধে যে ধারণা ফুটে ওঠে

তাকে উভয়েই অবিদ্যা বলেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে নিজের সীমিত স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গী হতে যে দেখে সে বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন আকারে দেখে। ফলে সুখ দুঃখবোধে সে আন্দোলিত হয়, মৃত্যু হয় তার কাছে গভীর শোকের কারণ। এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্ব সম্বন্ধে যা ধারণা তাকেই উপনিষদে অবিদ্যা বলেছে। পরবর্তীকালে বুদ্ধ বা শঙ্করের চোখে তার যে হেয়ত্বের ধারণা ফুটে উঠেছিল তা উপনিষদে ঋষিকে স্পর্শ করেনি। তাঁদের ধারণায় এই সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গী দুটি বিশ্বসত্তার মূর্তরূপের পরিচয় দেয় দুভাবে। উভয়েই সত্য। দুইকে নিয়ে ব্রহ্মের মূর্তরূপের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে। সুতরাং অবিদ্যা অবজ্ঞার বিষয় নয়।

উপনিষদে তাই বারবার বলা হয়েছে দুঃখ, তাপ, শোক, বিশেষ করে মৃত্যুশোক দ্বারা আমরা পীড়িত হই তখনি যখন নানাত্বের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনকে দেখি। বিশ্বের অভিজ্ঞতা একটি নাট্যের মতো। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু তার উপাদান। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন দ্বৈতবোধের মোহ হতেই শোক। একত্বের অখন্ডতাবোধ হতে আসে মুক্তি। প্রাণের ধারা নিত্য, তা হতে মৃত্যুকে আলাদা করে দেখলে শোক আছে। অথচ মৃত্যুকে প্রাণধারার অঙ্গ হিসাবে দেখলে তা অখন্ড দোলায়িত প্রবাহ। তখন তা অমৃত।

মৃত্য ও মৃত্যু সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে যে আলোচনা পাওয়া যায়, তার অতীত পটভূমিতে রয়েছে ঋগ্বেদ। ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ। তবু ঋগ্বেদের পূর্বেও মানুষ ছিল। তাদের বিশ্বাস, জীবনাচারণ, চিন্তা প্রভৃতি বৈদিক যুগকে প্রভাবিত করে নি এমন কথা বলা যায় না। প্রতিটি যুগই তার পূর্ববর্তী যুগচিন্তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

প্রভাবিত হয়। ভারতবর্ষে আর্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্বে অনার্য জাতি বাস করত। মৃত্যু জন্মান্তর ও আত্মা প্রভৃতি তাদের ও বিশেষ ধারণা থাকা স্বাভাবিক। আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে যে তারা তাদের নিজস্ব যাবতীয় ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেছে এমন কথা ভাবা যায় না। ফলে আর্য-অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে পরবর্তীকালীন ধর্মবিশ্বাস।

মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে তাদের মনে হয়েছে - এ কোনো শক্তিমান দেবতা বা অপদেবতার খেয়াল। তাদের মনে হয়েছে অপদেবতা প্রকৃতির বিভিন্ন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে অথবা হিংস্র প্রাণীর রূপ নিয়ে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। আবার অপদেবতা বায়বীয় রূপ ধারণ করেও উপস্থিত হতে পারে। তাই অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে আদিম মানুষ নানারূপ উপঢৌকন দিত। সাপের মত হিংস্র প্রাণীকে বা বজ্রপাত, ঝঞ্ঝা প্রভৃতিকে দেবতা বলে পূজা করেছে। তাতেও মন তুষ্ট না হলে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, জাদুবিদ্যার সাহায্যে রোগ এবং মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছে। তাদের মনে হত মৃত্যুর আত্মা অশরীরী হলেও তাদের কামনা বাসনা আছে, তারা ইচ্ছা করলে জীবিত ব্যক্তির মঙ্গল বা অমঙ্গল সাধন করতে পারে। তাই আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে শ্মশানে বা কবরে বিভিন্ন রূপ আহার্য দ্রব্য, পরিধেয় বা সাধ্যমত অন্যান্য বহু উপকরণ দেওয়া হত।

বিভিন্ন দেশ অনুসন্ধান করে নৃ-বিজ্ঞানীরা কবরের মধ্যে এই সব জিনিসের অবশেষ দেখতে পেয়েছেন। এ থেকে তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, আদিম যুগেও আত্মাকে দেহ থেকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে বিশ্বাস করা হত। মৃত্যুর ফলে এই আত্মা ধ্বংস হয় না এবং এই আত্মা পুনরায় মনুষ্যদেহ ধারণ করতে পারে,

পক্ষীরূপে বা মৎস্যরূপে বা অন্য কোন প্রাণীর রূপে ফিরে আসতে পারে, এ বিশ্বাসও সে যুগে ছিল।[৭] এই জন্যই যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে প্রিয় ছিল, মৃত্যুর পরে তাকেই সকলে ভয় করতে আরম্ভ করে।[৮] অবশ্য এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মৃত কবরে বিভিন্ন জিনিস উপহার দেবার পিছনে শুধু ভীতিভাব কার্যকরী হয়েছে তাও বলা উচিত নয় এক্ষেত্রে স্নেহ ও প্রীতি বশেও এজাতীয় উপকরণ নিবেদন করা সম্ভব। তবে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে সে যুগে মৃত্যুতে সবশেষ হয়ে যায় একথা স্বীকার করা হত না।

আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রশ্নটি স্বপ্নতত্ত্বের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে। মৃত ব্যক্তির স্বপ্নে আবির্ভাব ঘটে। সাধারণের বিশ্বাস যতক্ষণ ব্যক্তির আত্মা নতুন করে জন্মগ্রহণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পূর্বজীবনকে কেন্দ্র করে আপন জনদের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে থাকে।

নবজন্ম ঘটলে পূর্বজন্মের স্মৃতি ক্রমে বিনষ্ট হয়। বলা হয় পূর্বজন্মের স্মৃতি আছন্ন থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বজন্মের স্মৃতি বর্তমান থাকতে দেখা যায় তাদের জাতিস্মর বলা হয়ে থাকে।

শিশু যে জন্মের সাথে সাথে মুখভঙ্গির সাহায্যে আনন্দ প্রকাশ করতে চেষ্টা করে, তার পিছনে রয়েছে তার পূর্বজন্মের সুখ দু:খের অনুভূতি।[৯]

তবে ভরতবর্ষে জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতবাদ ঘোষনা করেছিল একটি দর্শন। এই দর্শনের নাম হল চার্বাক বা জড়বাদী লোকায়েত দর্শন। এ দর্শন ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কর্মফলবাদ বা পরজন্মবাদকেও তারা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের মতে

মৃত্যুর পরে যে দেহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়, ফিরে আসে না। এই দর্শনানুসারীদের মতে মৃত্যুর পর ভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হলে পূর্বদেহে চৈতন্যশক্তি আর ফিরে আসতে পারে না। তাঁদের মতে গুড়, তন্ডুল প্রভৃতি মাদক দ্রব্য থেকে যেমন সুরা সৃষ্টি হতে পারে তেমনি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এই চারিভূত অনেকগুণ হলেও এরা মিলিত হয়ে দেহের মধ্যে চৈতন্যের উৎপত্তি করে। আত্মার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। ধূর্ত পুরোহিতেরা স্বর্গ, নরক, ইহকাল, পরকাল প্রভৃতির কথা বলে সাধারণ মানুষকে ব্যয়বহুল নানা অনুষ্ঠান করতে বাধ্য করে এবং জনসাধারণকে প্রতারিত করে অর্থসংগ্রহ করে।

চার্বাক দর্শনের আপাতমধুর বানী ভারতীয় জনমানসে স্থায়ী হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম বেদবিরোধী নাস্তিক ধর্ম হয়েও কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করে। বেদবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও জৈন ধর্ম কর্মফল ও জন্মান্তর বিশ্বাস করে বলেই ভারতবর্ষের জনমানসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

বৈষ্ণব ধর্মদর্শনেও জন্মান্তর বাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভক্তিরসকেই বৈষ্ণবরা প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। মোক্ষ এদের কাম্য নয়। বৈষ্ণব ধর্মের মূলে আছে রাধা-কৃষ্ণের লীলা। ভক্তির মধ্যে এই লীলারসের আনন্দ প্রত্যক্ষ কর। তাঁদের মধ্যে দিয়েই ভগবত উপলব্ধি করলে ব্রাহ্মণে'র জ্ঞানও জন্মায়। তাই বৈষ্ণবদের কাছে 'শুদ্ধাভক্তি'র স্থান জ্ঞানেরও উপরে।[১০]

বৈষ্ণবদের লীলাতত্ত্বে যে মূল কথা বলা হয়েছে তা হল 'বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, সকল বস্তু, সকল বৈচিত্র্য, মানব জীবনের সকল ঘটনা, সকল উত্থান

পতন সুখ দু:খ জন্মমৃত্যু - সমস্তই শ্রী ভগবানের রসলীলা বলিয়া গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।[১১] সুতরাং বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে মৃত্যুতে দু:খের কোন কারণ দেখা যায়না।

সমস্ত রকম আলোচনা থেকে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি : জীবন মৃত্যু দুটোর স্বরূপ মানুষের অজানা হলেও জন্মের বা জীবনের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন মানুষের মনকে ব্যাকুল করেনা কিন্তু মৃত্যু নিয়ে মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই। মানুষ এ বিষয়ে নতুন কোন তথ্য আবিষ্কার করতেপারে না তবু প্রশ্নের শেষ নেই। জীবন মানুষের কাছে প্রিয়, দীর্ঘ জীবন মানুষের কাম্য। 'মৃত্যু কী'? এ সমস্যার সমাধান অপেক্ষা মৃত্যুর পরে অবস্থা সম্পর্কে জানার কৌতুহল অধিকতর।

আলোচনা গুলি থেকে মৃত্যুর পর কী হয়েছে - প্রশ্নের তিনটি সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যাচ্ছে।

যেমন - একটি উত্তর হল, মৃত্যুতে জীবন সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। জীবনে কোন পূর্ব-পর নেই।

দ্বিতীয় উত্তর হল, মৃত্যুর পর কর্মফলানুযায়ী জীব স্বর্গে অথবা নরকে বাস করে।

তৃতীয় উত্তর হল, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জীব বারম্বার আবর্তিত হয়। কর্মফলানুযায়ী জীবের মৃত্যুর পর আবার নবজন্ম ঘটে।

আমরা মৃত্যুর স্বরূপ ও তাৎপর্য তত্ত্বগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পেয়েছি যুগ যুগ ধরে মুনি-ঋষিগণ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ মৃত্যুর

নানা ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন। প্রাচীনকাল হতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ অবধি মৃত্যু রহস্য মানুষকে ভাবিয়ে চলেছে। সর্বদেশের সর্বকালের ধর্ম-প্রবক্তারা নিজ চিন্তা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। সাধারণ মানুষেরও এ বিষয়ে সমান কৌতুহল পোষণ করে এসেছে। এ বিষয়ে সংস্কার দানা বেঁধেছে। আপন বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মৃত্যু সম্মন্ধে একটি ধারণা গড়ে তুলেছে - পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, পরজন্ম ইত্যাদি বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে ফিরেছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকাতে কোন মত ও বিশ্বাসকেই মানুষ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। মৃত্যু রহস্য অনুদ্‌ঘটিত রয়ে গেছে বলেই ধরা যেতে পারে।

মানুষ জীবনে নানা কারণে দু:খ পায় কিন্তু মৃত্যু ছাড়া দু:খের মতো এত নিদারুণ সত্য কিছুই হতে পারে না। মানুষ জীবনের দু:খময়তাকে তুচ্ছ করে দেখতে পারলো না। সুখ ও দু:খ দুটোকেই তাদের অর্থময় মনে হল। সাহিত্যিকরা দু:খ বেদনা মৃত্যুকে আস্বাদযোগ্য বলে মনে করতে আরম্ভ করলেন। সুখ ও আনন্দের সঙ্গে দু:খ বেদনাকে ও সাহিত্যের মধ্যে চিত্রিত করে তুলতে চাইলেন সাহিত্যিকরা। ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান-বস্তুতান্ত্রিকতা এবং ভোগবাদ উনবিংশ শতাব্দির বাঙালী মনেও সাড়া জাগালো; বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-চেতনার সূত্রপাত হল। শোক-ভাবই ট্র্যাজেডির মুখ্যভাব। মৃত্যুই শোক-ভাবকে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শে বিষাদাত্মক পরিণতিতে যদিও প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি বরং নিষিদ্ধই ছিল। ফলে উপন্যাস নামে প্রচলিত রচনাগুলিতে জীবনের ট্র্যাজেডি প্রথমে রূপায়িত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালীর এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও চতুর্দশ শতাব্দি থেকেই ইংরাজী সাহিত্যে ট্র্যাজেডি রচনার প্রবণতা দেখা দেয়। ট্র্যাজেডি

মাত্রেই মৃত্যুর এক বিশেষ ভূমিকা থেকে যায়। অবশ্য মৃত্যু ছাড়াও ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, ''আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি সকল গুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণত লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে শেষকালে মরা না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সেত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে''।[১২] রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা অনুধাবন করেই আমরা বলতে পারি উপন্যাসে বা নাটকের অন্তিমে এসে যখন আমরা দেখতে পাই পাত্রপাত্রীর জীবন থেকে বেঁচে থাকার আকুলতা ও আনন্দ নি:শেষ হয়েছে। বিশাল শূন্যতা ও হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে। মানুষ যখন অসহায় বোধ করে, জীবনের সবকিছুই নিরর্থক বলে প্রতিভাত হয়, পায়ের তলার মাটি যেন ধসে যেতে থাকে পাঠক হৃদয়কে কাঁদিয়ে তোলে তখনই তা হয়ে ওঠে সার্থক ট্র্যাজেডি। এদিক থেকে বিচার করলে পাশ্চাত্য সাহিত্যে হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ট্র্যাজেডির প্রাচীনতম উদাহরণ। প্রাচ্যে রামায়ণ-মহাভারতে ট্র্যাজেডি এই দিকটি লক্ষ্য করা যায়।

গ্রীক সাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডি যথেষ্ট সংখ্যায় রচিত হয়েছে। গ্রীক বিশেষতা ছিল এইখানে যে ট্র্যাজেডির কারণ দৈবনিয়ন্ত্রিত ছিল। মানুষগুলি দৈব ও নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্যায় ও অনুচিত কাজ করতে বাধ্য হত যার ফলে জীবনে মারাত্মক ও করুণ পরিণতি ঘটত। এই ধরনের ট্র্যাজেডি ছাড়া

আর এক ধরণের ট্র্যাজেডি উল্লেখ করা যেতে পারে যা পরবর্তীকালের ইংরাজী সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে যেখানে নিয়তি মুখ্য নয়। চরিত্রই মুখ্য, যে জ্ঞাতসারে ঝোঁকে পড়ে অন্যায় বা পাপ করে ফেলে ও মারাত্মক ফল ভোগ করে। পরবর্তীকালে এই ট্র্যাজেডিগুলিকে রোমান্টিক ট্র্যাজেডি বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রীক ট্র্যাজেডি ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডি হিসাবে বিশেষত্ব লাভ করেছে। এক্ষেত্রে রোমান্টিক ট্র্যাজেডি বলতে শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি উল্লেখ করা যেতে পারে। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিকে ট্র্যাজেডির আদর্শরূপ হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্র্যাজেডিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত: ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডি, দ্বিতীয়ত: রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। উভয়ক্ষেত্রে মানুষের দু:খ দুর্দুশা ও বিপর্যয়ের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, এসেছে, ভয়াবহ মৃত্যু। কিন্তু ক্লাসিকাল বা গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দৈব বা নিয়তির তাড়নায় মানুষের সর্বনাশ ঘটছে। মানুষ এখানে অসহায়। তাঁর করণীয় কিছুই নেই সে নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র অন্যদিকে রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য প্রবৃত্তির ঝোঁকে ভুল করে। অন্যায় করে। ভ্রান্তি বশত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অনেক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করে ফেলে সহসা সে কুটিল পথে নেমে যায়। ভ্রান্তি সংশোধনের ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তারমধ্যে দেখা দেয় ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব চরিত্রকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জীবন্ত করে তোলে। এক্ষেত্রে ব্র্যাডলি - শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে বলেছেন যে,

> ''শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিতে নায়কের মৃত্যু ঘটবেই এবং এই মৃত্যু আসে নায়কের অপরিসীম দু:খ-দুর্দশার পথ ধরে। এই দু:খ-দুর্দশার বর্ণনা

গ্রীক ট্র্যাজেডিতে যেমন, তেমনি রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতেও ট্র্যাজেডির মূল রসনিস্পত্তির পক্ষে অপরিহার্য। নায়কের জীবনের পূর্বের সুখ-সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই দু:খ-দুর্দশার তীব্রতা হবে অসাধারণ এবং দ্রুত।''

সুবিখ্যাত শেক্সপীয়ারের সমালোচক ব্র্যাডলি শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি সম্মন্ধে আরো বলেছেন যে একজন উঁচুদরের মানুষ স্বকৃতকর্মের ফলস্বরূপ অস্বাভাবিক দু:খ-কষ্ট ভোগ করেন এবং পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখানে এই যে মানুষের অস্বভাবির দু:খকষ্ট ভোগ করার কথা বলা হয়েছে, এইটিই ট্র্যাজেডি আবর্তে নিপাতিত মানুষের প্রতি আমাদের সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলে এবং আমরা শোকার্ত হই।

রোমান্টিক ট্র্যাজেডি ও গ্রীক ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় উভযক্ষেত্রেই মৃত্যু আছে। সেক্ষেত্রে বিশেষ কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না। উভয় ক্ষেত্রেই মৃত্যুর ভয়াবহতা বা ভয়ঙ্কর পরিণতি অঙ্কিত হয়েছে। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু ঘটেছে নিয়তির তাড়নায়। অন্যায় না করলে, পাপ না থাকলে কষ্ট পেতে হয়। মানুষ এখানে দৈবনির্ভর, নিয়তির হাতের অসহায় পুতুলমাত্র। রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে যেমন শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে মানুষ নিজের কর্মের জন্য চারিত্রিক কারণে নিজের বিপদ ডেকে আনে। তবে রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে যা উপন্যাসকে জীবন্ত করে তোলে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী লেখকের জীবনের দু:খ, গ্লানি ব্যথাভরা পরিণতি নিয়ে তাকে কলাসুন্দর রূপ দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে বাঙলা

সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে জীবনের ট্র্যাজেডি ভরা পরিণতি বা মৃত্যু যথোচিত ভাবে চিত্রিত হয় নাই। সেখানে ভারতীয় সংস্কারই প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন এমন ধারণায় বিশ্বাসী ভারতীয় হিসাবে কোন লেখকের পক্ষে জীবনের দু:খের ও ভাঙ্গনের চিত্তমন্থনকারী প্রবলরূপের ভয়াবহতাকে বেশীক্ষণ সহ্য করা কঠিন। মৃত্যু ভয়াবহতা ঘেরা ট্র্যাজেডি রস ভারতীয় রসচৈতন্যের আনুকুল্য লাভ করে না। তবে ট্র্যাজেডিরসাত্মক উপন্যাসে জীবনের দু:খ ও ভাঙ্গনের এই প্রবল রূপ কল্পনায় লেখককে দেখতে হয় বলে সেই ভয়াবহতা কল্পনায় অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। তাই বলে বাঙালীর পক্ষে ট্র্যাজেডি রচনা অসম্ভব হয়নি। বঙ্কিমের পূর্বে কেবলমাত্র নাটকেই তারা ট্র্যাজেডি চেতনাকে প্রকাশ করেছে, সেই ট্র্যাজেডি রচনাগুলি ট্র্যাজেডির একটি প্রজাতি অর্থাৎ প্যাথেটিক শ্রেনীর ট্র্যাজেডি হিসাবেই চিহ্নিত হয়। প্যাথেটিক শ্রেনীর ট্র্যাজেডিকে এ্যারিষ্টটল স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সর্ব প্রথম বঙ্কিম চন্দ্রই বাংলাসাহিত্যে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চেতনাকে রূপায়িত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন বাংলা উপন্যাসের সৃস্টিকর্তা। তাঁর হাতেই বাংলা উপন্যাস পূর্ণতা ও সৌন্দর্যলাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনাগুলিতে ইংরেজী উপন্যাসের অনুসরণ থাকলেও কোন ক্ষেত্রে সেগুলি বিসদৃশ্য ছিল না। বঙ্কিম তাঁর রচিত উপন্যাসে মৃত্যুকে কিভাবে বিধৃত করেছেন। মৃত্যু সম্মন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বা কি? - এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। বঙ্কিমরচিত উপন্যাস তিনটি ধারায় মূলত প্রবাহিত হয়েছে। অতীত তথা ইতিহাস সন্ধান, পরিবার ও সমাজ ধর্মের

রূপায়ণ এবং স্ব-সৃষ্ট তত্ত্বাদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তিনটি ধারায়। বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসগুলি ছিল কল্পনা সমৃদ্ধ এবং রোমান্সাশ্রয়ী। তাঁর রচিত আখ্যায়িকা, প্রকাশভঙ্গী সবই শ্রেষ্ট রোমান্সের পরিচয় বহন করে। আর সেই জন্যই হয়ত তার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সাধারণ নর নারীর পর্যায় পড়েনা।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন প্রাচীন হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী। বঙ্কিম রচিত প্রত্যেক চরিত্রই একটি বৃহত্তর আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। তাই চরিত্রগুলির মধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার একাগ্রতা দেখা গেছে। এই চরিত্র একটি বিশেষ গুণ ও দোষকে আশ্রয় করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের চরিত্রও তিনি এঁকেছেন। তবে চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন কামনা মানুষকে কিভাবে কতটা উন্মত্ত করে তুলতে পারে। প্রচলিত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি প্রদর্শনের জন্য এই নীতি গ্রহণ করেন। রোমান্স-ই বঙ্কিম উপন্যাসের সাধারণ ধর্ম বলা যেতে পারে। কাহিনী নির্বাচনের সমকালীনতার অনুবর্তনে বঙ্কিমের শিল্প প্রচেষ্টা ঘটেনি। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের রসবিলাসী মন মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার বাইরে যেতে পারে নি। ঘটনাবহুল রোমহর্ষক কাহিনী নির্বাচনে তাঁর ঝোঁক বেশী লক্ষণীয়। জমকালো ঘটনার সমাবেশেই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যস্ত থেকেছেন। প্রাত্যহিক জীবনের ছোটছোট ঘটনা তাঁর দৃষ্টি কমই আকর্ষণ করেছে। তাঁর প্রথম ইংরাজী উপন্যাস 'রাজমোহনস ওয়াইফ্' থেকে শুরু করে, দুর্গেশ নন্দিনী, কপালকুন্ডলা, চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী, ইন্দিরা, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, বৃষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, সীতারাম প্রভৃতি প্রায় সকল উপন্যাসেই অভাবনীয় ঘটনা সংঘটনের উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। রাজমোহনস্ ওয়াইফ্ — এ স্ত্রী হত্যার উদ্যোগ, মাতঙ্গিনীর গৃহত্যাগ,

রাজমোহনের সঙ্গে ডাকাত সর্দারের যুদ্ধ, মথুরের আত্মহত্যা, দুর্গেশ নন্দিনীতে ডুয়েল লড়াই-য়ের দৃশ্য, কপালকুন্ডলায় বলিদানের ভয়াবহ দৃশ্য, চন্দ্রশেখরে নারীহরণ এবং উদ্ধারের চমকপ্রদ ক্রিয়াকলাপ, দেবীচৌধুরাণীতে মেয়ে ডাকাতের কাহিনী, ইন্দিরা-য় স্ত্রীর ছদ্মপরিচয়ে বসবাস, রজণীতে দরিদ্র অন্ধমেয়ের হঠাৎ বিশাল সম্পত্তি লাভ, যুগলাঙ্গুরীয়তে দীর্ঘ রহস্যে ঘেরা বিবাহ; বিষবৃক্ষে অলৌকিক স্বপ্নাদেশ গৃহবধূর গৃহত্যাগ ফিরে পাওয়ার চমকপ্রদ কাহিনী, কৃষ্ণকান্তের উইলে আত্মহত্যার চেষ্টা ও নারী হত্যার উত্তেজক ঘটনা, আনন্দমঠে দুর্ভিক্ষপরবর্তী বাংলার তথা জঙ্গলের বিভীষিকাময় ছবি, সশস্ত্র সাহেবকে এক ছদ্মবেশিনীর বোকা বানানো, সীতারামে বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারের চমকপ্রদ স্নায়ু টান করা গল্প এই সকলের মধ্যে বঙ্কিমের কল্পনাবিলাসী মনের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী চমক প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার কল্পিত স্ত্রী-পুরুষ আপন প্রণয়-স্বপ্নে বিহ্বল, হৃদয়ারণ্যে তাদের বসবাস দৈনন্দিন সংসার জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, হৃদয়দ্বন্দ্বের প্রণয় ব্যাকুলতা ছাড়া বৃহৎ কর্মজীবনে তাদের স্থান নেই। প্রতিদিনের সংসার যাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন নরনারীরা বাইরের চরিত্র, আমাদের ঘরের পরিচিত মানুষ নয়। এছাড়া সাধু-সন্ন্যাসী, গণনা, যোগবল ও অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের উপস্থাপনা বেশী দেখা যায়।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইংরাজী উপন্যাস সৃষ্টি প্রথম থেকেই উপন্যাসের অঙ্গ-প্রকরনের আলোচনার কোনটি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করবে চরিত্র চিত্রণ না ঘটনাবলী এই নিয়ে দুটি দল গঠন হয়ে যায়। একদল তত্ত্বের দিক থেকে ঘটনাকে প্রাধান্য দিলেন, অপর দল চরিত্রকে। ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের

তত্ত্ববিদ ই. এম. ফরষ্টার-এর মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিতে গল্প শোনার ঝোঁক বেশী। মানুষের মধ্যে একটা চিরকালের শিশু রয়েছে সে গল্প শুনতে ভালবাসে। মানুষের সেই প্রবৃত্তিকেই কাজে লাগায় ঔপন্যাসিক। কাজে লাগায় অবশ্য নানান উদ্দেশ্যে, কেউ মহত্তর কোন ভাবনা প্রকাশের জন্য, কেউ আপন ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্য, কেউ বা শুধু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য। মোটকথা সব বোধগম্য উপন্যাসের মূল উপাদান হল গল্প।

ফরষ্টার অবশ্য বলেছেন যে ভাল উপন্যাসে সময়ের পারম্পর্যে ঘটনা সাজানোর গুরুত্ব যেমন আছে তেমনি গভীরতাও থাকা দরকার। এই গভীরতাকেই তিনি বলেছেন Value বা মূল্য।[১৩]

প্লট গঠনে বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্ত ভঙ্গির অনুরাগী ছিলেন। এক বা একাধিক উপপ্রসঙ্গ বা উপকাহিনী যোগে প্লটকে জটিল করে তোলার প্রয়াস চালাতেন। কোথাও মূল থেকে কিছু পৃথক প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বিবৃত করতেন, আবার কখন তাঁর উপকাহিনী নিজস্বভাবে বিস্তার লাভ করত।

মূলত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ধর্ম তত্ত্বের প্রচার করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের মত ধর্মাবলম্বীর দেশে তিনি অসাম্প্রদায়িক, সার্ব্বজনীন এক ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন লোকশিক্ষা এবং মানুষের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন তার রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে করতেন সকল কর্মকে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট করতে হবে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে যে সুখ তা ক্ষণিক; পরে দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। সুতরাং তিনি মনে করতেন সেই সুখই প্রকৃত সুখ

যা স্থায়ী। যে সকল কার্যে সকলের মঙ্গল সেই কার্যকে রুচিকর মনে করেছেন। বঙ্কিমের ধর্মে সঙ্কীর্ণতা ছিলনা। তাই তাঁর মতে, ''উপন্যাসে একটি বিশেষ ভাবনাকে বিস্তারিত করে তোলাই আসল কাজ, তখন বিশেষ ভাবনা বলতে তিনি লেখকের জীবন সম্পর্কিত একটি বিশেষ ধারণাকেই যে বোঝাতে চেয়েছেন এ-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।''[১৪]

বঙ্কিমচন্দ্র কতকটা নিরপেক্ষ দুরত্ব থেকে গোটা জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন দেখার এই রীতিকে মহাকবির উচ্চাঙ্গের নাট্যকারের। কাহিনীর সর্বত্র লেখকের এই দৃষ্টি প্রসারিত যেন তিনি একটু উপর থেকে আলো ফেলে জীবনের গোটা মঞ্চকেই আলোকিত করে তুলতে চান। একটু দূর থেকে হলেও তাঁর মমত্ব সর্বব্যাপী কিন্তু উচ্ছ্বসিত আসক্তিতে লিপ্ত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি কোথাও চ্যুত নন এমন নয় - সেখানে তাঁর দুর্বলতা সচরাচর নীতি বা ধর্মঘটিত উদ্দেশ্য আরোপিত হয়ে এই চ্যুতি ঘটিয়েছে।[১৫]

বঙ্কিমের শিল্পসৃষ্টিতে প্রচুর পরিমাণ নাট্যরস বিদ্যমান। নাট্যরস প্রবণতার জন্য তার উপন্যাসে খন্ড পরিকল্পনা পরিচ্ছেদ - বিভাগ, ঘটনা, গতি সমস্তই নাট্যানুগ পরিকল্পনায় বিধৃত। মানুষের চরিত্রের মধ্যেই তাদের অদৃষ্টের বীজ নিহিত থাকে। সেই বীজ ক্রমে বাইরের ঘটনার সংস্পর্শে এসে কিভাবে মহীরুহে পরিণত হয়, ঘটনা সংস্থানের ন্যায় শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে বঙ্কিম সে কথাটি স্পষ্ট করে তুলতে চান। ট্র্যাজেডির নির্মম আকর্ষণে মানুষের নিম্নাবতরণ ঘটে। ঘটনার বীজ উপ্ত হয়ে গাছে পরিণত হয়। তাই তো বিষবৃক্ষের ফসল সকলে মিলে আহরণ করেছে দীর্ঘ জীবন ধরে। যেমন কুন্দের আত্মহত্যা,

রোহিনী হত্যা, ভ্রমরের মৃত্যু উপন্যাসের শেষে ট্র্যাজেডির ঘনঘটার পরও সুসমতা আনার প্রয়াসে শেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষণীয় যেমন প্রতাপের মৃত্যু দৃশ্য। প্রতাপের মৃত্যুর পর চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জীবন হয়ত সুখকর হয়েছিল। ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কুন্দনন্দিনী ও রোহিনীকে জীবনের বলিদান দিতে হয়েছে।

বঙ্কিমের শিল্প সৃষ্টিতে ভাষারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভাষার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের দৃষ্টিকোণ ছিল মধ্যপন্থী - বিদ্যাসাগরী ও অন্যান্য রীতির মিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে খাটলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ উপন্যাস শিল্প। ফলে শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখা চলেনা। উপন্যাসের বিচিত্র মনোভাব, রূপ বর্ণনা, ঘটনার গতি সৃষ্টি বা প্রবৃত্তি তরঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে ভাষার নানা ধরণের মিশ্রণ ঘটাতে হয়েছে কোথাও ভাষা চঞ্চল, দ্রুতগতি, কখনো মন্থর, এছাড়া কখন বিপরীত লয়ের উত্থানপতন। ছোট বড় নানা আকারের ও জাতের শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল যে উপন্যাসের অবলম্বন ভাষা এবং বিষয়বস্তু মানুষের হৃদয়। আর মানুষের হৃদয়কে প্রকাশের জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন তা হল চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা ও কার্যাদি। এই সকল বিভিন্ন উপাদানের সহায়তায় বাক্যকে অবলম্বন করে মানুষের হৃদয়কে পরিস্ফুট করে তোলাই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মূল কাজ। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ না করে উপায় নেই যে বঙ্কিমের গদ্য সাধারণ মানুষের কর্মময় দৈনিক চিত্রাঙ্কনে পরাঙ্মুখ। বস্তুত বলা যেতে পারে বঙ্কিমের উন্নীত গদ্যময় ভাষা কপালকুন্ডলার পরিবেশ রচনায় যে পরিমাণ স্বচ্ছন্দ হয়েছে তেমনটি মানুষের আটপৌরে চেহারা আঁকতে নয়। বঙ্কিম যুদ্ধ-

বর্ণনায় যতটা সার্থক গৃহছালি বর্ণনায় সে পরিমাণ সার্থক নন। উনিশ শতকের অফিস আদালত বা একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্ক কিংবা ঘাত প্রতিঘাতের বর্ণনা বঙ্কিম উপন্যাসে অনুপস্থিত। তিনি সেগুলি এড়িয়ে চলতেন বলা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যখনই মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা বা ব্যর্থতা চিত্রিত হয়েছে সেক্ষেত্রে এক অমোঘ অনৈসর্গিক শক্তির বিশাল ভূমিকা চোখে পড়েছে। নিয়তির ক্রূর লীলাকে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। নিয়তি যে ভাগ্য রচনা করে দিয়েছে মানুষ তার অন্যথা ঘটাতে পরবে না। যেমনটি দেখা যায় গ্রীক ট্র্যাজেডিতে। শেক্সপীয়রও নিয়তির বিধানকে মেনে নিয়েছেন। এক্ষত্রে বঙ্কিম রচনায় গ্রীক ও শেক্সপীয়রের প্রভাব থাকলেও বঙ্কিম ট্র্যাজেডিতে তা একটু অন্যরকম। এখানে নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে মানুষ বিশেষভাবে সচেতন তবুও তারা সাবধান হতে পারেন নি, সাবধান হলেও নিয়তি তাদের নিস্কৃতি দেয়নি। যেমন ভাবে মৃণালিনীতে মনোরমা নিজ বিধিলিপি কথা জানতে পেরেও সাবধান হতে পারেননি। মনোরমার শিশু বয়সের ভাগ্য গণনার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। ভয়ানক বিধিলিপিকে খন্ডন করার চেষ্টাও মনোরমার ব্যর্থ হয়। মনে হয় বিধিলিপি অজ্ঞাতসারে প্ররোচিত করে তার নির্দেশানুসারে মনোরমাকে চালিত করতে থাকে। পশুপতির মৃত্যুর পর বিধির লিখন ও নিয়তির লীলাই যেন তীব্রভাবে সত্য হয়ে ওঠে। মনোরমার মনে ধারণা জন্মে যে তাঁর বিধিলিপিতে বৈধব্য যোগ ছিল তা তিনি এড়াতে পারেন নি সুতরাং বিধিলিপি সম্পূর্ণ সত্য হতে চলেছে। তাঁর মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মৃত্যুর

আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত বিধিলিপিই চূড়ান্তভাবে সত্য প্রমাণিত হল।

একইভাবে বিধিলিপিকে বাস্তবায়িত হতে দেখি বঙ্কিমের লেখা রাজসিংহ উপন্যাসে। প্রবৃত্তির কাছে অসহায় মবারকের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে লাভ করাই শ্রেয় মনে হয়েছিল। জ্যোতিষীর ভাগ্য গণনা আশ্চর্যভাবে সত্য প্রমাণিত করে স্ত্রী দরিয়ার বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। এখানেও মৃত্যুর আগমন ঘটে নিয়তির হাত ধরে।

বিধিলিপিই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় সীতারাম উপন্যাসে গঙ্গারামের ক্ষেত্রে। অন্য উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও বঙ্কিম জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্যোতিষের গণনা অনুযায়ী শ্রী প্রিয়প্রাণ হন্ত্রী হবেন। এই গণনা শ্রীকে স্বামীসুখ থেকে বঞ্চিত রাখে। শ্রী স্বামীর মঙ্গলের জন্য চিরদিনের মত নিজেকে স্বামীর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন অথচ জ্যোতিষ বচনকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। সহোদরের হত্যার মধ্যে দিয়ে সেই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়ে উঠল।

নিয়তির টানে জীবনের বলিদান দিতে হয় চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দলনী বেগমকে।

প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নিয়তির হাতের পুতুল হয়ে মৃত্যু বরণ করে 'মৃণালিনী' উপন্যাসে পশুপতি। অন্যদিকে অধঃপতনের পথে পা বাড়িয়ে বিধবা রোহিণীর তাৎক্ষনিক ইন্দ্রিয় সুখের স্পৃহা এবং সমাজের নিয়মকে লঙ্ঘন করার শাস্তি স্বরূপ তার অপমৃত্যু ঘটে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে। আনন্দমঠ উপন্যাসে সন্তানদলের আদর্শ থেকে স্খলনের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বিবেকের

দংশনে আত্মদান করেন ভবানন্দ। গোবিন্দলালের নিষ্ঠুর অবহেলা জনিত অভিমানই বঙ্কিম উপন্যাসের দুই নারী চরিত্রকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ভ্রমর এবং 'সীতারাম' উপন্যাসে রমা চরিত্র এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভ্রমরের মনে আশা ছিল স্বামীর মধ্যে মনুষ্যত্ব ফিরে আসবে। নিষ্কলঙ্ক ভাবে না হলে স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আশা তার মনে ছিল যখন হত্যাকারী হিসেবে স্বামীর পরিচয় লাভ করল তখন তার রুচিবোধ এবং ধর্মবোধ হাহাকার করে ওঠে। এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুকে সে কাছে ডেকে নেয়। মৃত্যুকালে ভ্রমর স্বামীর পদধূলি নিয়ে সে এই আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করল যেন সে জন্মান্তরে সুখী হয়। অন্যদিকে রমার মনে সংশয় জেগেছিল গঙ্গারামকে কেন্দ্র করে তার যে কলঙ্ক রটে সেই অপবাদে স্বামী তাকে ত্যাগ করেছেন। এই আত্মগ্লানি ও স্বামীর প্রতি অভিমানে সে ঔষধ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। মৃত্যুকেই কাছে টেনে নিয়েছে। মৃত্যুকালে স্বামীর পায়ের ধূলো নিয়ে জন্মান্তরে যেন তাকেই স্বামী রূপে পায় এই আশীর্ব্বাদ চেয়ে নিয়ে ক্রমে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। বিষবৃক্ষে বিধবা নায়িকা কুন্দনন্দিনীর বিবাহিত পুরুষ নগেন্দ্রর প্রতি আসক্তি এবং বিবাহ ক্রমে মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে আমরা দেখতে পাই। মৃত মাতা স্বপ্নে এসে বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এক অশুভ শক্তি ক্রমে তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। মৃত মাতার স্বপ্নে চিহ্নিত একটি নারী ও একটি পুরুষ বাস্তব জীবনে চিনতে পেরেও এড়িয়ে যেতে পারেনি কুন্দ। শেষ পর্যন্ত হীরা দাসীর চক্রান্ত এবং প্রথমা স্ত্রী সূর্যমুখী ও স্বামীর সুখের জন্যই নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হল কুন্দনন্দিনী। বিষপান করে আত্মহত্যা করল সে। বিধবা নারীর জীবনে নতুন করে দাম্পত্য সুখ যে সম্ভব

নয় তারই যেন একটা ইঙ্গিত হয়তো বঙ্কিমের রচনা থেকে আমরা পেয়ে থাকি। এই উপন্যাসেই দেবেন্দ্র চরিত্রকে তার পাপাচরণের চরম পরিণতি হিসেবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তার মৃত্যুকালীন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সত্যিই মর্মান্তিক। বঙ্কিম রচিত আদর্শ চরিত্র প্রতাপ। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই আত্মচিত্তের সংযম রক্ষার্থে ও পরের মঙ্গলার্থে আত্মবিসর্জনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে অপূর্ব উৎকর্ষতা লাভ করেছে প্রতাপ চরিত্র। একইভাবে 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে একেবারেই ভিন্ন এক পরিবেশে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠা কপালকুন্ডলা পরার্থে দিয়েছেন আত্মবলিদান। সাংসারিক বিষয়ে নিস্পৃহ উদাসীন কপালকুন্ডলা যেন অমোঘ নিয়তির তাড়নায় ট্র্যাজেডির দিকে এগিয়ে যায়। আত্মবলিদানই মা ভবানীর নির্দেশ মনে করে সে নিজেকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, কপালকুন্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

এখন পর্যন্ত আমরা বঙ্কিম উপন্যাস এবং বঙ্কিমের দৃষ্টিতে মৃত্যু কিভাবে বিধৃত হয়েছে তারই আলোচনা করেছি। এবার দৃষ্টি আরোপ করবো রবীন্দ্র উপন্যাসের উপর এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী তাঁর উপন্যাসে মৃত্যুর ভূমিকা কেমন আলোচনা করবো। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনার পূর্বে কবি রবীন্দ্রনাথ হিসেবে তাঁর যথার্থ পরিচয়কেই আমাদের স্মরণ করতে হবে। কবিতা ও কাব্য রচনা তাঁর সহজাত প্রতিভার প্রকৃত অঙ্গ। উপন্যাস রচনা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার শাখা মাত্র যা বাংলার সাহিত্য ভান্ডারে অমূল্য সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তিম পর্বে রবীন্দ্র প্রতিভার আত্মপ্রকাশ। সমস্ত বাংলা জুড়ে তখন মধ্যযুগীয়

ধারার বাতাবরণ। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' মানুষের মনে তেমনভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু 'চোখের বালি' উপন্যাসটি প্রকাশের পর থেকে তিনি যথার্থ ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচয় লাভ করেন। 'রাজর্ষি'-র প্রায় পনের বছর পর তিনি 'চোখের বালি' উপন্যাসটি লেখেন। ইতিমধ্যেই তিনি সার্থক ছোট গল্পের লেখক হিসেবে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বল্পসংখ্যক উপন্যাসই রচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু সেইগুলি সৌন্দর্যে ও শিল্পরীতি বৈশিষ্ট্যে বিস্ময়কর সৃষ্টি হয়ে আছে।

'করুণা' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের যাত্রারম্ভ হয় এবং 'চার অধ্যায়' দিয়ে শেষ। তিনি বোধহয় সবচেয়ে অবহেলা করেছেন 'করুণা' উপন্যাসটির ক্ষেত্রে। সাময়িক পত্রে অসম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশিত কখনই তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেননি। নিতান্ত অল্প বয়সে এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাবু-সমাজের দুর্নীতি গ্রস্থ, আত্মপ্রবঞ্চক জীবনের পটভূমিতে এই উপন্যাসটি তিনি রচনা করেন। বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি গড়ে তুলেছেন তিনি। পরবর্তী উপন্যাস 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' রচনা করেন যেখানে ট্র্যাজেডি পরিকল্পনায় বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই উপন্যাসের শিল্প সাফল্য নিয়ে তিনি নিজেই যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। সুরমার মৃত্যু এই উপন্যাসে প্রকৃত ট্র্যাজিক রস ফুটিয়ে তুলেছে। এরপর রচিত হয় রাজর্ষি যেখানে আমরা পাই রাজতন্ত্র বনাম পুরোহিত তন্ত্রের মধ্যযুগীয় সংঘাত। 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' এর মত রাজর্ষি উপন্যাসে অল্পবিস্তর বিবৃতি ধর্মী সংক্ষিপ্ত

উপসংহার রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অনেকাংশেই বঙ্কিমী প্রভাব লক্ষণীয়। 'চোখের বালি' রচনার মধ্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুটি নারী জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। এক দরিদ্র কন্যা বালবিধবার অচরিতার্থ জীবন পিপাসাই এখানে মূল হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত নিয়তির কাছে পরাভব স্বীকার করে তার সকল বাসনা। সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের বিচিত্র রূপ চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন সূক্ষ্ম কৌশল ও জটিল কারুকর্মের নিখুঁত পরিচয়। 'নষ্টনীড়' সেই সময়ের লেখা এক কঠিন রচনা। এর ঠিক পরেই লিখেছেন ঘটনাবহুল উপন্যাস নৌকাডুবি। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের রচিত এক বিরাট উপন্যাস। 'গোরা'তে পাত্র পাত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির উদারতা, অন্যদিকে হিন্দু সমাজের অনুদারতা, বৈষম্য বোধ। সমাজ, ধর্ম ও ব্যক্তির যে সতত বিরোধ ও সমন্বয়ের চেষ্টা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। 'গোরা' উপন্যাস রচনার পর রবীন্দ্র উপন্যাসে এক ভাবগত পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। উপন্যাসের সাধারণ ও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক প্রকার তীক্ষ্ণ কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য, সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থ গৌরবপূর্ণ উক্তি আমাদের যে চমৎকৃত এবং অভিভূত করে তোলে স্বীকার না করে উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস হিসেবে চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুইবোন ও মালঞ্চ উল্লেখযোগ্য। ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে তাঁর কবি প্রতিভার স্পর্শে উপন্যাস গুলি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তাই আজ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস গুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অমূল্য সম্পদ।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনচর্চাই রবীন্দ্র উপন্যাসের বিষয়-ভিত্তি। কালের হাত ধরেই অগ্রসর হয়েছে রবীন্দ্র উপন্যাস। আদর্শ প্লটের উপর চরিত্র ভিত্তি গড়ে তোলাই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যক্তির অন্তরাজ্যকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন তিনি। রবীন্দ্র উপন্যাসে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছা আবর্তিত হয়েছে ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রেম, পারিবারিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি উল্লেখ করে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে প্রথাবাদ সমাজব্যবস্থা থেকে মানুষকে বের করে এনে এক সজীব গণতান্ত্রিক অনুভব দিতে চেয়েছিলেন তিনি। গড়ে তুলতে চেয়েছেন নতুন কালের নতুন মানুষ। 'গোরা' সেই ধর্মসংস্কারক আন্দোলনের প্রতিনিধি। সেই শতকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ রূপটি তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর 'ঘরে-বাইরে' ও চার অধ্যায়' উপন্যাসে। শিকড়হীন জনসমাজ বিচ্ছিন্ন, শিক্ষিতের আমদানী করা য়ুরোপী ও রাজনীতির সঙ্গে একমত হতে পারেন নি তিনি। বিদেশী জিনিষ বয়কট থেকে তাঁর কাছে সেই যুগে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল নিজেদের মধ্যে বিভেদ দূর করা, তা সে ভেদ সামাজিক হোক বা সাম্প্রদায়িক।

রবীন্দ্র উপন্যাসে আমরা দেখি কালোপযোগী এক নতুন Life pattern । পারিবারিক কাঠামো বজায় রেখেই এই নতুন ধারার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন তিনি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রেও নতুন ধারণা দিয়েছেন তিনি। নারীকে পারিবারিক পরিচর্যা ও কর্তব্যপালনের সংকীর্ণ সীমারেখায় বন্দী না রেখে আত্মবিকাশের নিজস্ব পথ দেখিয়েছেন তিনি। এই নতুন Life pattern এ পারস্পরিক দায়িত্ববোধের নতুন সূত্রের উপর জোর

দিয়েছেন তিনি। নারীদের স্বাধীন সত্তার গৌরব আছে তাঁর উপন্যাসে। রবীন্দ্র উপন্যাসে আমরা নারীকে দেখি প্রতিবাদী ভূমিকায়। তবে এই প্রতিবাদ অন্যকে আঘাত করে না, শুধু এই প্রতিবাদ তাদের নিজস্ব সত্তা নিপীড়নের বিরুদ্ধে। তারা প্রত্যাশা করেছে আত্মমর্যাদার গৌরব ও প্রাপ্য অধিকারটুকু।

অন্যদিকে রবীন্দ্র উপন্যাসের পুরুষ চরিত্ররা বেশীর ভাগই হয় জমিদার নয়তো ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, শিক্ষক বা ব্যবসাদার। ধর্ম, সভা-সমিতি, সমাজ সেবা, শিল্পচর্চা নিয়ে মগ্ন উপন্যাসের নায়করা বাঙালী। উচ্চ বা মধ্যবিত্তের ঔজ্জ্বল্য ও ম্লানতার, সংগ্রাম এবং আশাভঙ্গের ইতিহাসে মূর্ত। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী নগরের নগর বিলাসী মনের মুক্ত মানস-বিহারই রবীন্দ্র উপন্যাসের উপজীব্য।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে সাহিত্য অবসর বিনোদনের উপকরণ মাত্র নয়। সাহিত্য হল সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রকাশ। রবীন্দ্র দর্শন অনুযায়ী সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেয় আর সেই আনন্দ অনুভূতি থেকেই সাহিত্য সৃষ্টি প্রেরণা আসে। কল্পনাবিষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ রসবাদী আলঙ্কারিকদের নীতি অনুসরণ করে সাহিত্যকে রসাত্মক করতে চেয়েছেন।

এতক্ষণ আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করে তাঁর রচনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করলাম। এখন আমরা দেখবো সত্য ও সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে মৃত্যুকে কিভাবে বিধৃত করেছেন। অমৃতের সন্ধানী রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ও উপন্যাসে তার প্রভাব নিয়ে এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

''রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কবি প্রতিভার মূল প্রেরণাই আধ্যাত্ম-চিন্তা। এ বিষয়ে তিনি নিজেও অবহিত ছিলেন। তাই দেখি তিনি বলেছেন যে তাঁর কাব্য-জীবন ও আধ্যাত্ম -জীবন তাঁর অজান্তে একই পথ অনুসরণ করেছে।''[১৬]

প্রকৃতির ঘনিষ্ট সংযোগের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্ম জীবন শুরু হয়। প্রকৃতির নানা মাধুর্যের এক প্রচ্ছন্ন সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতেন তিনি। তাঁর মনে হত সেই মহাসত্তা অলক্ষ্য থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি রবীন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের এক গভীর প্রভাব ছিল। উপনিষদের আনন্দবাদ সমগ্র অন্তঃকরণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন তিনি। ''উপনিষদের মূলতত্ত্ব বলে অ'হেতুক আনন্দ আস্বাদের জন্য মূল সত্তা নিজের উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে সৃষ্টি প্রবাহে পরিবর্তিত হলেন। তাতে ভোক্তাভোগ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত হলো বহুজীব ও বহু বস্তু। প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর ছন্দে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হল। প্রাণের ধারা অক্ষুন্ন, কিন্তু বিশেষ জীব বিনাশশীল; তার মৃত্যু আছে। ফলে তার আত্মীয়ের মৃত্যু শোক ভোগ আছে। দ্বৈতবোধ হতেই এই শোকবোধ। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে উপলব্ধি হবে বিশ্বে যে মহানাট্য অভিনীত হচ্ছে তার চরিত্র ও নাট্যকার অভিন্ন। তাঁর উদ্দেশ্য, বিশ্বশিল্প রচনার মধ্য দিয়ে আনন্দ আস্বাদন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী যদি নিজের মনে ফোটাতে পারি, তা হলে দুঃখ-শোক তার দাহিকা শক্তি হারায়। বিচ্ছিন্ন দ্বৈতবোধের মোহ হতেই শোক। একত্বের অখন্ডতাবোধ তা হতে আসে মুক্তি।''[১৭] উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় মৃত্যুর যে ব্যাখ্যা তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ধারণাকেই অনুসরণ করেছেন।

'রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছিলেন ''জীবনে সব পাওয়া যায় না - মৃত্যু আনে আর এক জীবন - আর এক সৃষ্টি। ... ... সেই 'চির নূতনকে'ই কর্ণধার রূপে আহ্বান করে কবি গেয়েছেন-

'সমুখে শান্তি পারাবার

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার'[১৮]

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও মৃত্যু প্রথমে এক রহস্য হয়েই দেখা দিয়েছিল। মৃত্যু নির্মম নিষ্করুণ ভয়ংকর রূপের সম্মুখে তিনি বড় অসহায় বোধ করেছেন। নৈরাশ্য জেগেছে তার জীবন জুড়ে। তারপর বার বার হানা মৃত্যুর আঘাত তাকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করেছে। তিনি মৃত্যুর ও মৃত্যুজনিত বেদনা ও ভয়ের সঙ্গে এক বোঝাপড়ার পথ খুঁজেছেন ক্রমে তিনি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে লিখেছেন। তিনি অনুভব করেছেন বিশ্ব সংসার জুড়ে যে আনন্দ ধারা প্রবাহিত হয়েছে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও তার উপাদান সম্বন্ধে যে উপলব্ধি জেগেছে তাঁর সাহিত্য, তাঁর রচনা সেই প্রভাব থেকে স্বাভাবিক ভাবেই মুক্ত হতে পারে না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রগুলি বাস্তবের ধূলোমাটি ভরা। আমাদের অতিপরিচিত জগতেরই মানুষ তাই তাদের ব্যথা-বেদনা আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা', যেখানে তিনি অতিশয় নৈপুন্য সহ করুণার ট্র্যাজেডি চিত্রিত করেছেন। সাংসারিক জীবনের অকল্পনীয় দুর্ভোগ তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। এখানে লেখক বিনাদোষে করুণাকে অকল্পনীয় দুঃখ ভোগ করিয়ে দুঃখান্তক পরিণতির দিকেই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। হয়তো লেখকের সেটাই উদ্দেশ্য ছিল যেহেতু লেখাখানি অসম্পূর্ণ উপন্যাস বলে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা

যায় তাই এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তবে মনে হয় লেখক মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই করুণার ট্র্যাজিক জীবনের পরিণতি ঘটাতে চেয়েছেন। স্বামীর অপ্রেমের নিকট করুণার প্রেমের বেদনাদায়ক পরাজয়। যা তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরো বেশী করুণ রস ছড়িয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে করুণার অন্তিম মুহূর্তের দৃশ্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে 'হতবুদ্ধি প্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল, করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রর হাত ধরিল। কিন্তু কিছু কহিল না'। হয়তো বহু দিনের সঞ্চিত অনেক কথা তার বুকের মধ্যে জমে ছিল যা শোনার সময় নরেন্দ্রর হয়নি, এক বুক অভিমান তাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। কিছু না বলার মধ্যে দিয়েই করুণার অনেক না বলা ব্যথা ফুটে উঠেছে যা করুণা চরিত্রকে অনেক বেশী উদ্ভাসিত করে তোলে।

এরপর 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের সুরমার মৃত্যু নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। এক্ষেত্রে সুরমার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় সুরমাকে। সুরমার মত চরিত্রের পক্ষে এমন মৃত্যু সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। রাজ মহিষীর পুত্রবধূর প্রতি বিদ্বেষ পূর্ণ ব্যবহার অবাধ্যবধূকে বশীভূত করার কুসংস্কারই ফল হিসেবে মূল্যবান জীবন হারাতে হয় সুরমাকে।

সুরমাকে সাধারণ বাঙালী বধূর মতই শাশুড়ির বিদ্বেষ জ্বালায় দগ্ধ হতে হয়। সুরমার আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যুতে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষিত। একদিকে রাণীমার পুত্রবধূকে বশীভূত করার প্রয়াস অন্যদিকে রুক্মিণী অর্থাৎ মঙ্গলার কুটিল ষড়যন্ত্রে সুরমার মত সুন্দর ও মহৎ জীবনের অবসান ঘটে। সুরমা এক পারিবারিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। সুরমার ব্যক্তিত্ব আর প্রেমই উদয়াদিত্যের জীবনের শক্তি। পত্নীবিয়োগ তাকে ব্যথাতুর করে তোলে। সুরমার মত মহীয়সী

নারীর এভাবে অপমৃত্যু উপন্যাসে করুণ রসের সঞ্চার করে। এদিক থেকে বিচার করলে সুরমা একটি ট্র্যাজিক চরিত্র। সুরমার চরিত্রচিত্রণের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সার্থক শিল্পকর্মের পরিচয় দিয়েছেন।

এই উপন্যাসের অপর একটি মৃত্যু দৃশ্য তা হল মহামানব বসন্ত রায়ের মৃত্যুদৃশ্য। এই মৃত্যু ও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, হত্যাকান্ড। পবিত্র এক দেবোপম চরিত্রের প্রতাপাদিত্যের আদেশে ঘাতকের হাতে ঘটানো হয় নির্মম মৃত্যু। এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড দিয়ে লেখক একদিকে দাম্ভিক প্রতাপাদিত্যের হৃদয়হীন কাপুরুষতা প্রকাশ করছেন অন্যদিকে উদার, নির্মল চরিত্রের মানুষ বসন্ত রায়ের মৃত্যুভয়হীন নির্বিকার চিত্তকে উদ্ভাসিত করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও নিষ্ঠুর ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহশীল পিতৃব্যের স্নেহের প্রকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের চরিত্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক মনে হলেও বাস্তবে ইতিহাসের তথ্যভিত্তিক নয়। শিল্পীর ইতিহাসের সংস্রবে তৈরী কল্পিত নিজস্ব সৃষ্টি মনে হয় চরিত্রগুলি। উপন্যাসের বসন্ত রায় প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকা প্রকৃতির সঙ্গে একাঙ্গীভূত এক নির্বিকার মানুষ। ধর্মে, কর্মে জীবন দৃষ্টিতে উদার বসন্ত রায় মৃত্যুতেও ভয়হীন বীর। স্নেহ এবং আনন্দ বিলিয়েই আনন্দ ও অমৃত লাভ করতে চেয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে বসন্ত রায় চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের উপর যে উপনিষদের প্রভাব ছিল তা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই বসন্ত রায় মৃত্যুকে সহজভাবে আহ্বান জানাতে পেরেছিলেন।

এরপর আমরা আলোচনা করতে পারি 'রাজর্ষি' উপন্যাসের জয়সিংহের মৃত্যু নিয়ে। প্রকৃতিপ্রেমী স্নেহশীল রাজা গোবিন্দমানিক্যের হৃদয় থেকে সকল

সংস্কারের বেড়া খসিয়ে দিয়েছিল বালিকা হাসির মৃত্যু। বলি বন্ধের আদেশ দিয়ে লোকের অভ্যস্ত বিশ্বাসে আঘাত হানলেন তিনি। দেবী ভূবনেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত (চোন্তাই) রঘুপতি জয়সিংহের পালক পিতা। তারই ষড়যন্ত্রে দেবীর আদেশে রাজরক্ত আনবার দায়িত্ব পড়ল জয়সিংহের উপর। একদিকে প্রশান্তচিত্ত নির্মল ঋষিচরিত্রের মানুষ গোবিন্দমানিক্য, অন্যদিকে পালক পিতার নিষ্ঠুর নির্দেশ, দেবীর প্রতি ভক্তি ও আবাল্য সংস্কার সব মিলে এক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের শিকার হলেন জয়সিংহ। সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংশয় ঘুচিয়ে আপন রক্তে সুখী করতে চান দেবীকে। এখানে লেখক তুলে ধরেছেন সনাতন ধর্মে আবিষ্ট অথচ চরম বস্তুনিষ্ঠ জয়সিংহের অন্তরের দ্বন্দ্বকে। এক চূড়ান্ত সংকটময় পরিস্থিতিতে উপনীত হন জয়সিংহ। আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে তার হৃদয়ের রক্তঝরা সংগ্রামের অবসান ঘটে। জয়সিংহের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে পাঠক হৃদয়কে নাড়া দেয়। আমাদের হৃদয় শোকাবহ হয়ে ওঠে। উপন্যাসে ছড়িয়ে পড়ে পরিপূর্ণ একটি ট্র্যাজেডির ভাব।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মৃত্যুর পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে নিরূপণ করার চেষ্টা করবো। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্যাসের কয়েকটি মৃত্যু নিয়ে এক্ষেত্রে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি। এই মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুধাবন করার প্রয়াস করছি।

এক্ষেত্রে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনীর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আঙ্গিক রীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন লেখক। পূর্বে লেখা উপন্যাসগুলি থেকে ভিন্নতর। উপন্যাসের চারটি চরিত্র

দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন লেখক এবং শেষ জনের উপর দিয়েছেন গল্প বলার দায়িত্বভার। শেষ খন্ডে গল্পকার শ্রী বিলাসের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে উপন্যাস এক করুণ রসাত্মক পরিণতি লাভ করে।

এখানে দামিনীর হৃদয় উজাড় করা প্রেম ও প্রেমাস্পদের পক্ষ হতে প্রত্যাখান ও উপেক্ষা জনিত বেদনা আর শ্রীবিলাসের মত প্রেমিক ও কর্তব্যপরায়ণ স্বামীকে প্রতিদানে কিছু না দিতে পারার যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত রূপটি দামিনীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠতে দেখা যায়। সাধক শচীশ বন্ধন মুক্ত অরূপের সন্ধানে ছুটে চলেছে। দামিনীর প্রেমকে সে সাধনার ক্ষেত্রে বাঁধা বলেই মনে করেছে। আদিম গুহার অন্ধকারে শচীশের নির্দয় পদাঘাতের ব্যথাই দুরারোগ্য ব্যাধির আকার ধারন করে। মৃত্যর যন্ত্রণা ও হৃদয় যন্ত্রণা একাকার হয়ে দামিনী-চরিত্রকে করে তুলেছে মর্মস্পর্শী। সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ দামিনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন মানব প্রবৃত্তির প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে কোন সাধনাই সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাই দামিনী চরিত্রকে এত জীবন্ত মনে হয়।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনীর পরই মনে আসে 'ঘরে বাইরে'-এর নিখিলেশের কথা।

রবিন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' বাংলা সাহিত্যের অন্যন্য সম্পদ। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র নিখিলেশ উদার, মহৎ, বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন এক আদর্শবাদী মানুষ। বিমলার প্রতি তার ছিল নিখাদ প্রেম এবং স্বামী হিসেবেও ছিল যথেষ্ট দায়িত্ববান। সে চেয়েছিল বিমলাকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে। নিখিলেশ চেয়েছিল সাবেকী সামন্তবাদী পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন। সে

চায়নি বিমলাও সনাতন ধর্মী নারীদের মত স্বামীকে দেবতা মনে করে, পূজা করার মনোভাব নিয়ে নিজেকে সংসার ও অন্দর মহলের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখে। সে চেয়েছিল নারী সত্তার বিকাশ। যারা সভায় সমিতিতে স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা করে তারাই বাড়ী ফিরে স্ত্রীর উপর প্রভুত্বের রাশটা শক্ত করে ধরে রাখতে চায়। নিখিলেশ তাদের দলে নয়। তাই শিক্ষা দীক্ষা, আদব কায়দায়, পোষাক পরিচ্ছদে বিমলার মধ্যে নবরুচির প্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা চলতে থাকে। সেই সময় প্রবেশ ঘটে স্বদেশী আন্দোলনের পুরোধা নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপের। সন্দীপের বাক্‌চাতুর্য্য ও প্রাণপ্রাচুর্য্যের সম্মোহনে মন্ত্রমুগ্ধের মতই আবেগ সর্বস্ব হয়ে বিমলা ঝাঁপ দিল দেশহিতের কর্মব্রতে। সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে সে সন্দীপ-সাহচর্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সন্দীপের স্বদেশী মশালের ফুলকি নিখিলেশের দাম্পত্য সুখে আগুন ধরিয়ে দিল। আত্মমুখী অভিমানী স্বভাবী নিখিলেশ অন্তর জ্বালায় জ্বলতে লাগলো কিন্তু সাধারণ স্বামীর মতো শাসনের মাধ্যমে স্ত্রীকে ধরে রাখতে চাইলো না। সন্দীপের প্রচারধর্মিতা, বাক্‌সর্বস্বতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আত্মভোগ পরায়ণ রূপের পরিচয় পেতেই মোহভঙ্গ হল বিমলার। নিখিলেশের মহত্ব ও প্রকৃত স্বদেশ প্রেম নতুন করে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় বিমলা। তীব্র অনুশোচনা নিয়ে নিখিলেশের কাছে ফিরে এসেছে সে। নিখিলেশের প্রেমভরা মহৎ হৃদয় অনুতপ্তা স্ত্রীকে দুরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। স্ত্রীকে পুরানো মর্যাদায় গ্রহণ করেছে সে। নিখিলেশ শ্রেনীধর্মে জনিদার, ধনবাদী নাগরিকের প্রতিনিধি সে। কিন্তু ব্যক্তিধর্মে নিখিলেশ উদার ও আদর্শবাদী। সে প্রকৃত দেশ প্রেমী, যুক্তিজ্ঞানী, স্থিতধীপুরুষ। প্রজার হিত তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও হিন্দু-মুসলমানের

সম্প্রীতি তার কাম্য। স্বদেশীদের উগ্র উন্মাদনাকর আন্দোলনকে বরাবর সমালোচনা করেছে সে। সন্দীপ নিখিলেশের বাড়ীছেড়ে চলে যাবার পরই নিখিলেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে বেড়িয়ে যায়। গভীর রাত্রে মরণাপন্ন অবস্থায় তাকে বাড়ীতে আনা হয়। এখানে লেখক নিখিলেশের মৃত্যু স্পষ্টভাবে দেখান নি তবে চিকিৎসকরা তার জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নন এমন আভাস পাওয়া যায়। যা তার মৃত্যুর ইঙ্গিত-ই বহনকরে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে নিখিলেশের জীবনের এটাই হয়তো সুন্দর, শৈল্পিক পরিণতি। হয়তো রবীন্দ্রনাথ সরাসরি নিখিলেশকে মৃত ঘোষনা না করে পাঠকদের নিজনিজ চিন্তাধারা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপরই এই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। একদিকে চিন্তা করলে মনে হবে নিখিলেশের জীবনের উপর দিয়ে যে বিপর্যয় ঘটে গেছে এরপর তার মরা-বাঁচা সমান। দাম্পত্য জীবনে যে ফাটল ধরেছে তা চিরকালের মতো তার জীবনের মাধুর্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে তাই তার ট্র্যাজেডি ভরা জীবনের একমাত্র পরিণতি বোধহয় মৃত্যু। হয়তো নিখিলেশ ক্ষমা করে দিলেও বিধিলিপি বিমলাকে তার ভুলের শাস্তি এইভাবেই দিতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে নিখিলেশের মৃত্যু দৃশ্য চিত্রণের মধ্যে ঔপনাসিক রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনা কৌশলের বহি:প্রকাশ নজরে পড়ে।

নিখিলেশের পরই মনে পড়ে নীরজার রোমাঞ্চকর মৃত্যু। 'মালঞ্চ' রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা এক অন্যতম নারীচরিত্র, নীরজা অতি সাধারণ রক্তমাংসের গড়া নারী, তাকে লেখক ত্যাগের মহিমায় মহীয়সী করে গড়ে তোলেন নি। নীরজা চরিত্রের মধ্যে এক রুগ্ন, শয্যাশায়ী, মৃত্যু পথযাত্রীর যন্ত্রণাকেই মূর্ত করে তোলা হয়েছে। মৃত্যুর সম্মুখে

উপস্থিত এক নারীর জীবনতৃষ্ণাই প্রকট হয়ে উঠেছে কাহিনীর মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে রোগ শয্যায় শায়িত নীরজা অনুভব করে তার স্বামীর ভালবাসায় চির ধরেছে, স্বামীর পরিবর্তন রুগ্না নীরজার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে ক্রমে অনুভব করেছে তার অতি আদরের সাজানো বাগান, তিল তিল করে ভালবাসা দিয়ে গড়ে তোলা সংসারে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। ক্রমে সেই স্থান দখল করে চলেছে সরলা। এই সহজ সত্যকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। ঈর্ষার অনলে দগ্ধ হতে থাকে সে। রবীন্দ্রনাথের মনে এক সময় জীবন মৃত্যুকে নিয়ে প্রশ্ন জেগেছিল তারই ঝলক যেন নীরজা অন্তরে উঁকি দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের যেমন মনে হয়েছিল 'এই সংসারে সব কিছুই থাকবে শুধু আমি থাকবো না' এই ব্যথা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের নীরজা ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসিনী নয়। তার দুরারোগ্য ব্যাধি, হতাশা তাকে খিটখিটে করে তোলে, সে তার চারিত্রিক মাধুর্য হারায়। সে সন্দিগ্ধমনা নিষ্ঠুর হিংস্র হয়ে ওঠে। মৃত্যু মুহূর্তে আমরা তাঁর ঈর্ষাক্লিষ্ট অর্ধউন্মাদ রূপটি দেখতে পাই। এখানে নিয়তির কাছে পরাজিতা একটি অতিসাধারণ নারীর বীভৎস, অনুকম্পাহীন মৃত্যুর দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। তাঁর সর্বগ্রাসী ঈর্ষায় নীরজা যতই সংকীর্নচেতা হয়ে উঠুক না কেন এই বঞ্চিতা অনুকম্পনীয়া নারীর প্রতি আমাদের বেদনার সঞ্চার হয় বেশী। পীড়িত, মুমূর্ষু নীরজার প্রতি আদিত্য, সরলা যার মনে কারো স্নেহ সহানুভূতি চোখে পড়ে না। দাম্পত্য জীবনের সব মধুময় স্মৃতি যেন আদিত্যের মন থেকে মুছে গেছে। সরলার প্রতি দুর্নিবার রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা যেন প্রধান হয়ে ওঠে। মুমূর্ষু নীরজার প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে দেখা দিল ক্ষোভ। স্বামীর প্রতি অসহায় নীরজার আবেদন 'বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত

হবনা' তার প্রতি আমাদের মমতার উদ্রেক করে। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের সমাপ্তিটা 'মলোড্রামাটিক' মনে হলেও রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তবে রবীন্দ্রনাথের বিধৃত মৃত্যুগুলির মধ্যে এই মৃত্যু দৃশ্যটি অধিক নিষ্ঠুর, ভয়ানক বোধ হয়। ভাঙাগলা, চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে থাকা নীরজা, অন্তিম মুহূর্তে অস্বাভাবিক জোরে সরলার হাত চেপে ধরে বলতে থাকে, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।' তারপর টিলে শেমিজ পরা পাণ্ডুবর্ণ মূর্তি নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে তার শেষ কথা বলল 'পালা, পালা, পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত'। এ যেন তার সব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়া তীব্র জ্বালা, অসহায় অর্ন্তদাহ ও জীবন আকাঙ্ক্ষার বহি:প্রকাশ। যা রবীন্দ্রনাথের চিত্রিত শান্ত মহিমাময় মৃত্যুর তুলনায় অনেক বেশী করে পাঠক মনে রেখাপাত করে।

এরপর রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়'-এ রচিত 'এলার মৃত্যু' নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিতা এলার স্বদেশী দলে যোগদান, সংকল্প পালনের চেষ্টা ও সেই সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব। পুলিশে ধরা পড়ার সম্ভবনা জেনে দলের নেতা ইন্দ্রনাথ এলাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয় অতীনের উপর। অতীন কাহিনীর নায়ক, স্বদেশী দলের অন্যতম নেতা, এলার প্রেমিক। পুলিশের কাছ থেকে আত্মরক্ষার একটি উপায় বটুর কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়া যা এলাবতীর পক্ষে মৃত্যুর চাইতেও ভয়ানক। প্রেমিক অতীনের হাতে মৃত্যুবরণ তার থেকে শ্রেয় মনে হয় এলার কাছে। অতীন্দ্র এলাকে অসম্মানের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি

দেবার জন্য এলাকে হত্যা করার দায় নিজ হস্তে তুলে নেয়। মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে এলা মৃত্যুকে যেন ভয় পায়না। এক আবেগ তাড়িত অবস্থায় এলা অতীনকে আহ্বান জানাচ্ছে। সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। মৃত্যু বিভীষিকা কে ভোলানোর জন্য, অতীন এলাকে তিন বছর আগের অতীনের যে ঘটা করে জন্মদিন করেছিল তা স্মরণ করিয়েছে। মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে এলা স্মৃতিচারণে মগ্ন হয়। আমরা দেখেছি একদিন মোহমিশ্রিত ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে এলা এসেছিল ইন্দ্রনাথের দলে। নবযুগের দূতীরূপে আবেগে উৎসাহিতা এলা স্বদেশীদলে উপস্থিত হয়েই করেছিল বিষম প্রতিজ্ঞা। বিয়ে না করে তাঁর জীবন দেশের জন্য উৎসর্গ করবে বলে শপথ নিয়েছিল। দেশের কাছে বাগদত্তা তাই অতীনের প্রেমকে অস্বীকার করলে সে। অতি অল্পদিনেই দলের প্রতি মোহ হারাল এলা, অতীনের প্রেমরসম্মোহনে তারব্রত সংকল্প গেল টলে, তাই অন্তিমকালে অভিভূতের মতই বলতে থাকে 'মারো আমাকে অস্ত্র নিজ হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কিছু হতে পারে না' 'ভীরু নই আমি; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো।' প্রবল আবেগে ভাসতে ভাসতে অতীনের ইচ্ছাপূরণ করতে সে বলেছে 'দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও। মুখে হাসি টেনে, প্রেমের আবেগে ভেসে অকুতোভয় হতে চেয়েছে এলা। হতাশা, ব্যর্থতা, অবিশ্বাসের জ্বালা, প্রেমের নির্যাস হতে বঞ্চিত এলার মৃত্যু যেমন মর্মান্তিক তেমনি ভিন্ন ধাঁচের। এক্ষেত্রে দেখা যায় রবীন্দ্রসৃষ্ট চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই হৃদয়াবেগ এবং হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক সুকুমার সেনের ভাষায় ''বাহিরের ঘটনা সংঘাত অথবা

ব্যক্তি চিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ নয়, পাত্রপাত্রীর হৃদয়াবেগ ও হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তি সংঘর্ষ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করে।''[১৯]

এ পর্যন্ত আমরা বঙ্কিম উপন্যাস ও রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রধান প্রধান মৃত্যু গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। উপন্যাসে লেখকের তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মৃত্যু পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি আমরা লক্ষ্য করেছি আর সেই সঙ্গে মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে চরিত্রগুলির নিজস্ব অভিব্যক্তি, তাদের ব্যথা, যন্ত্রণা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হাহাকার। একদিকে জীবনতৃষ্ণা অন্যদিকে জীবন থেকে মুক্তিলাভের আকুতি। মৃত্যু এসেছে নানাভাবে নানারূপ ধরে। তবে মৃত্যুর এই পটভূমিকা তৈরীর ক্ষেত্রে দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় বিশেষ পার্থক্য। অধ্যাপক সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, ''বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর আচরণ অনেকটাই নাচের পুতুলের মতো, বহির্জগতের ঘটনা যেন সূত্রধার। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বহির্জগতের ঘটনা সূত্রধার নয় ... ...।''[২০] তত্ত্বগত দিক থেকে মৃত্যুর স্বরূপ ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করেছি আমরা। সাধারণভাবে মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে তারই বিশদ বিশ্লেষণ আমরা করেছি এই অধ্যায়ে। উপন্যাসের কাঠামোতে মৃত্যুর ভূমিকা কী হতে পারে বা ঘটনাবলীর মধ্যে মৃত্যুর উপযোগিতা কোথায় তারই উপর সীমিত আলোকপাত করেছি। যেহেতু এই অধ্যায় সমগ্র আলোচনার ভিত্তিভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তাই মৃত্যু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিশদভাবে করার সঙ্গে সঙ্গে দুই উপন্যাসে মৃত্যুর কিরূপ প্রতিফলন ঘটেছে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উপন্যাসে কালানুক্রমিক ভাবে মৃত্যু প্রসঙ্গগুলির সামগ্রিক আলোচনা করা হবে।

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয়খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা সপ্তম সংস্করণ ১৩৮৬, পৃ:১৫৭

২) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ:১২৯।

৩) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ:১৩৮।

৪) Antony Flew (ed.), Mind and Death, Macmillon, London 1967, p.22).

৫) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ:১৩৫-১৩৭।

৬) Tylor, E.B. Primitive Culture, 187, Vol.1. p. 387 (দ্রষ্টব্য : ধীরেন্দ্র দেবনাথ, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু, রবীন্দ্রভারতী, ১৯৬৬, পৃ: ২৪-২৯।

৭) Karsten, Rafeel, The Civilization of the South American Indians 1926) p.477.

৮) Surendranath Das Gupta, A History of Indian Philosophy, Vol.1, 1957 পৃ: ৩৬৩। তদৈব

৯) Sushil Kumar De, The Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, 1961, পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৩৮ (দ্রষ্টব্য : ধীরেন্দ্র দেবনাথ; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু, পৃষ্ঠা ৫১)

১০) অজিত কুমার চক্রবর্তী, কাব্য পরিক্রমা, ১৩৬৮, পৃ: ১২৮; তদৈব

১১) রবীন্দ্র রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৬২ পৃ: ৭৬ (দ্রষ্টব্য জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমের ট্র্যাজেডি-চেতনা)।

১২) সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৫৪)

১৩) তদৈব, পৃ: ২৫

১৪) ক্ষেত্রগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ শিল্পরীতি, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১২।

১৫) Religion of Man : The Vision (দ্রষ্টব্য: হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা - ২৮।

১৬) অদৈব, পৃষ্ঠা -১৪৪

১৭) প্রবাস জীবন চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ১০১।

১৮) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতহাস, চতুর্থখন্ড, আনন্দ পারলিশার্স, ১৩৮৮, পৃ: ৩১২

১৯) তদৈব, পৃ:৩১২

২০) তদৈব, পৃ:৩১২